জয়ন্ত দে
সাদা পোস্টার
কালো করোটি

সাদা পোস্টার কালো করোটি

জ য় ন্ত দে

সাদা পোস্টার
কালো করোটি

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২০

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

SADA POSTER KALO KOROTI

Adult Fiction

by Jayanta Dey

Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009

Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799

ISBN 978-81-8374-610-6

বিশ্বজিৎ বণিক ও শুক্লা বণিক

যাঁদের ঋণ আমি কখনও ভুলতে পারব না।

সূচিপত্র

পত্রভারতী প্রকাশিত লেখকের বই

অদৃশ্য অস্ত্রের আঘাত!

পেতনি আমার বউ

একটা খুনি চাই

অ্যান্টি হিরো

মৃত, না জীবিত

এই উপন্যাসটি আমিই লিখেছি। কেন লিখেছি? নিছক লেখার জন্যই কি লিখেছি? না কি লিখেছি কোনও রক্তক্ষরণে উপশম পেতে, কোনও যন্ত্রণা, কোনও কান্নার সাময়িক বেদনানাশক খুঁজে নিতে? না কি এই লেখা লিখলাম প্রচণ্ড জ্বালায়!

এই উপন্যাস প্রকাশ হওয়ার পর এক পাঠক আমাকে বলেছিলেন, এটি 'সর্তকতামূলক অ-রূপকথা'। একজন তাঁর ভয় পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। একজন মা ফোন ধরে শুধু কেঁদেছিলেন কিছুক্ষণ।

কোনও লেখকই চান না এ-ধরনের কাহিনির ভেতর ঘোরাফেরা করতে, জীবনের তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে দেশলাই কাঠি হয়ে পুড়তে। তবু জীবন কখনও-কখনও এমনই বাস্তবতার ভেতর দিয়ে নিয়ে যায়, এমনই মন ও শরীরের কঙ্কাল হয়ে আসা মানুষজনের সঙ্গে জীবনের লেনদেনের ঢের খাতা বয়ে বেড়াতে হয়।

এ কাহিনি কোনও ব্যক্তিগত গদ্য নয়। তবে এই কাহিনির ভেতর আমি, আমরা সবাই আছি, সেরেফ একটা দড়ির এপারে বা ওপারে। যে-কোনও সময় এই দড়ির সীমারেখা টপকে আমাদের বাড়ির একান্ত আপনজন চলে যেতে পারে ওদিকে। হয়তো মজা করে, নিছকই কৌতূহলে, হয়তো তার নিজেরই অজান্তে।

স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির আড়ালে-আবডালে ড্রাগ ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠছে। শহর কলকাতা এখন ড্রাগ ব্যবসার পীঠস্থান। গাঁজা থেকে ইয়াবা, কেমিক্যাল ড্রাগ মুড়ি-মুড়কির মতো বিকোচ্ছে। অনলাইনেও মিলছে। পরিস্থিতি ভয়াবহ।

না, আপনাকে ভয় দেখাচ্ছি না! আমি নীতিপুলিশও নই। কিন্তু বহু জীবন ঝরে যাচ্ছে অকালে, বহু বাবা মা কাঁদছেন লুকিয়ে...।

একবার চোখ মেলে দেখুন, রাংতা জীবনের নীচে পড়ে আছে শুধুই পোড়া দেশলাই কাঠি!

জয়ন্ত দে

১ জানুয়ারি ২০২০

কলকাতা

সাদা পোস্টার কালো করোটি

আমার এই কাহিনির ভেতর এক ষাঁড় আছে। যাঁরা এই কাহিনি পড়ছেন, বা পড়বেন ভেবেছেন তাঁদের বলি, সাবধান!

আসলে এই কাহিনির বাঁকে বাঁকে একটা ষাঁড় ঘুরে ফিরে আসবে। কালো অক্ষরের ভেতর দাপাদাপি করার চেষ্টা করবে। গোঁত গোঁত ফোঁস ফোঁস করবে। মাঝে মাঝে আপনার মনে হতেই পারে, ষাঁড়টা বুঝি আপনাকে গুঁতিয়ে দিতে পারে। আপনি, আতঙ্কে চারদিকে তাকাবেন। তবু তাই এই অধম লেখক, আমি, আপনাদের আগেভাগে সাবধান করে দিতে চাই।

আমি অবশ্য জানি আপনারা যথেষ্ট সাবধানী, বিপদ বুঝে যাবতীয় লাল সরিয়ে রেখেছেন। সিঁদুরকে ক্ষমা ঘেন্না করে সিঁথির রেখায় মেনে নিয়েছেন। রক্তের ক্ষেত্রে আপনাদের হাত-পা বাঁধা। শত চেষ্টা করেও আপনি রক্তের রং পালটাতে পারবেন না। আর আছে রক্তজবা! মা কালী লাল ছাড়া নীল ফুল তাঁর রাঙা পায়ে নেবেন না। তাই লাল ফুলই মাকে দিতে হচ্ছে।

আমার কাহিনির ষাঁড়টির নাম দারাসিং। ওকে এই নামেই সবাই ডাকে। দারাসিংয়ের চেহারা কিন্তু তেমন বড়সড় নয়। বরং এই এলাকায় আগে যে সব ষাঁড়েরা ছিল, তাদের তুলনায় দারাসিং বেশ বেঁটেই। পিঠের কুঁজটাও তেমন দর্শনধারী নয়। তার একটা শিং সামনের দিকে বল্লমের মতো, আর একটা শিং পাশের দিকে বেঁকে গেছে। দাঁড়ানো শিংটার জন্যই ষাঁড়টার নাম দারাসিং।

এ কাহিনিতে দারাসিংয়ের খুব বেশি কিছু অবদান নেই। এমনিতেই তার জীবন বলতে দোকান বাজার থেকে তোলা আদায় আর এলাকার গোরুদের সঙ্গে প্রেম করা। তার খুব প্রেম! খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সে গোরুদের পিছন পিছন সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ইদানীং সে খেপেছে। মধ্যরাতে হানা দিচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। আমাদের পাড়ায় ঢোকে রাত বারোটা নাগাদ।

দারাসিং আসার আগে ওর গররর গররর গর্জন, ওর ফোঁত ফোঁত দীর্ঘশ্বাস টানার শব্দ ভেসে আসে দূর থেকে। ওর এই রাতকালীন আওয়াজ এখন অনেকেই চেনে। আর তখনই এ-বাড়ির বারান্দায়, ও-বাড়ির জানলায় ছায়া ছায়া মানুষজন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আলো নেভে পটাপট। অনেকেই নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে চায় না, তারা নেভানো আলোর ভেতর ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এখন এদের সবার মুখে চাপা কৌতুক, কী হয়, কী হয়, একটা ব্যাপার।

যাদের গাড়ি রাস্তায় পার্ক করা থাকে, তাদের কয়েকজনের উৎকণ্ঠাও থাকে। যদি দারাসিং তাদের গাড়িতে শিং বাগিয়ে হামলা চালায়। বেশ কয়েকটি গাড়ির সামনে ও পিছনে দারাসিংয়ের হামলার চিহ্ন আছে। তবে বেশিরভাগ মানুষই রগড়ের রসে ফুটছে, ডুবছে। মজা দেখতে কে না ভালোবাসে! এই সব লুকোছাপার ভেতর যাদের কৌতূহল বড্ড বেশি তারা বারান্দায় বা জানলার কাচ সরিয়ে সামনাসামনি দৃশ্যমান হয়।

দারাসিং মাঝে মধ্যে তার গায়ের ধূসর রং ক্যামোফ্লেজ করে। কখনও সখনও সেটা হয়তো ভর সন্ধেবেলায়! যেমন আজ হল—

যিনি দেখলেন তাঁরা নাম অমিত্রসূদন। অমিত্রসূদন দাশগুপ্ত।

দারাসিং যেমন এই কাহিনির তেমন কিছু না, অমিত্রসূদনও তাই। কিন্তু তাঁর একটা পরিচয় আপনাদের দেওয়া দরকার।

মনে করুন, অমিত্রসূদন দাশগুপ্ত একজন সৎ-নাট্যকর্মী। ছোট দলের এক অনামী অভিনেতা কাম পরিচালক। কেন্দ্রীয় সরকারি গ্রান্ট পাওয়ার সে যথেষ্ট যোগ্য মানুষ। কিন্তু তিনি লবিতে ঠিক ঢুকতে পারেননি। তবে হ্যাঁ, তাঁর একটা দুর্নাম আছে—দুর্মুখ! বাংলাবাজারের দশ-বিশজন নাটক-করিয়ের নাম বললে তার নামটাও আসে। তবে ওই যে বললাম, ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারেনি। সম্মান পেয়েছেন। সম্মাননীয়।

নাটক নিয়ে এ কাহিনি নয়, তাই এর বেশি তাঁর পরিচয় দেওয়ার মতো কিছু নেই। তিনি অনেকটাই এই শহরের ভেতর বয়ে যাওয়া টালিনালার মতো। টলিসাহেব টালিনালা কেন খুঁড়েছিলেন সে কথা টালিনালা ভুলে গেছে। তার এখন একটাই কাজ, এই শহরের যাবতীয় নোংরা আবর্জনা ভরা জল মন্থর গতিতে টেনে নিয়ে যাওয়া। তার গায়ে প্লাস্টিক মাখামাখি পাঁক, বুকে দুর্গন্ধ, মুখে কোনও সৌন্দর্য নেই। সে শুধু শরীর টেনে টেনে চলেছে। টালিনালা যেমন, অমিত্রসূদন দাশগুপ্তও তেমন!

আসা যাক, আজ সন্ধেবেলায় দারাসিংয়ের ক্যামোফ্লেজ করার কথায়।

দুই

অমিত্রসূদন আজ সন্ধেবেলা তার বাড়ির গেটের সামনে দারাসিংকে দেখেছিল।

তখন সাড়ে সাতটা হবে, অফিস ফেরত অমিত্রসূদন রাস্তার বাঁক ঘুরে দেখল, তার বাড়ির গেটের সামনে ষাঁড়টা দাঁড়িয়ে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে বুঝল ষাঁড় নয়, ধূসর রঙের একটা স্করপিও তার বাড়ির গেট জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাড়ির গেট জুড়ে গাড়িটা কে রাখল? নাকি কেউ এল? এসময় কে এল তাদের বাড়িতে?

কাছে এসে যা জেনেছিল তা হল, এটা শুধু গাড়ি নয়, পুলিশের গাড়ি।

অমিত্রসূদন থমকে দাঁড়াল। গাড়ির বাইরে দু'জন দাঁড়িয়ে। তারা অমিত্রসূদনের দিকে এগিয়ে এল। বলল, 'আমরা লালবাজার থেকে আসছি। নারকোটিক্স সেল। আমার নাম দেবেশ ঘোষ। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব...।'

নারকোটিক্স সেল!

অমিত্রসূদনের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। সে কিছু একটা বুঝে, অথবা না বুঝে বলল, 'নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো? এনসিবি?'

'না, স্যার। আমরা লালবাজার থেকে আসছি নারকোটিক্স সেল।'

অমিত্রসূদন ওদের দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে থাকল কয়েক মিনিট। তারপর শ্বাস আটকে যাওয়া স্বরে বলল, 'বুঝেছি। আসুন। কেউ কি কোনও গণ্ডগোল বাধিয়েছে?'

কেউ বলতে অমিত্রসূদনের ছেলে আর্যনীল। সে তার ছেলের কথাই প্রথম ভাবল। আর কী বুঝেছে সে ঠিকমতো নিজেও জানে না। কিন্তু পুত্রসন্তানের বাপ হওয়ায় ইদানীং তাকে নানা আশঙ্কা সর্বদা কুরে কুরে খায়। দিনকাল যেন কেমন, গোলমেলে। তারমধ্যেও ক্ষীণ হয়ে থাকল দলের ছেলে মেয়েদের মুখও। ওরা কি কেউ—না, তার ছেলে?

বাড়ির একটা চাবি থাকে অমিত্রসূদনের কাছে। আজ সন্ধেবেলা শকুন্তলা থাকবে না। দরজার চাবি খুলতে খুলতে সে বলল, 'আজ আমার স্ত্রী একটু বেরিয়েছে।'

'হ্যাঁ, উনি আপনার পিসিমার বাড়ি গল্ফগ্রিনে গেছেন।'

অমিত্রসূদন একটু ঘাড় বাঁকিয়ে উত্তরদাতার দিকে তাকাল। বলল, 'হ্যাঁ পিসিমা খুব অসুস্থ। দুই ছেলেই বাইরে থাকে, তারা বৃদ্ধা মায়ের কাছে আসার সময় পায় না। আমার স্ত্রী সপ্তাহে দু-একদিন যায়। আর তো কেউ নেই। বুড়ো মানুষ। খুশি হন।'

পাশ থেকে একজন ফিসফিস করল, 'কী ছেলে মেয়ে সব! বুড়ো মা বাপকে দেখতে আসার সময় পায় না! মাল কামাচ্ছে।'

দেবেশ ঘোষ বলল, 'জানি। গত শনিবারও গিয়েছিলেন। আমরা শনিবারই আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি দেরি করে ফেরেন বলে আমরা আর আসিনি।'

'হ্যাঁ, শনিবার আমি শোভাবাজারের দিকে যাই। রিহার্সাল থাকে।'

'জানি। আমরা ওখানে গিয়ে কথা বলতে চাইনি। ওখানে সবাই থাকে।'

বাহ! এরা বেশ হোমওয়ার্ক করে এসেছে। অন্য সময় হলে ওদের সে বাহবা দিত। কিন্তু এখন ওদের এই হোমওয়ার্ক তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জল করে দিল। রিহার্সালে নয়, বাড়িতে তাহলে তার প্রথম আশঙ্কাই সত্যি! তার গ্রুপের কোনও ছেলে মেয়ে নয়, গোলমাল তার বাড়িতেই। মানে তার একমাত্র সন্তান।

সোমবার অমিত্রসূদন একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরে নিজের মতো করে সময় কাটায়। সাধারণত শনি ও রবিবার খুব ব্যস্ততা যায়, সোমবার দিনটা একটু নিজের মতো জিরিয়ে নেওয়ার দিন। অফিস ফেরতা কোনও কাজ রাখে না। সরাসরি বাড়ি আসা। লেখা, বইপড়া।

শকুন্তলা নিশ্চয়ই সন্ধের অনেক আগে বেরিয়েছে। কেননা সারাবাড়িতে কোথাও কোনও আলো জ্বলেনি। দরজার কাছেও বেশ অন্ধকার ঝিম মেরে পড়ে আছে। তাই হয়তো সে এই স্করপিওকে ষাঁড় ঠাওরেছে।

ষাঁড়! তার সারা শরীর ঘাম দিচ্ছে কুলকুল করে। সে দরজা খুলতে খুলতে নিজেকে শান্ত করল। এক দুই তিন...। যেন এটা নাটকের কোনও দৃশ্য, ব্যক্তিগত নয়।

সিঁড়ির আলো জ্বালিয়ে খুব ঠান্ডা গলায় অমিত্রসূদন বলল, 'আসুন।'

ওর পিছন পিছন ওরা উঠে আসছে। সাদা মার্বেলের সিঁড়ি। পালিশ করা কাঠের হাতল। দেওয়ালে ছবি। কোলাপসিবলের গেট খুলে দোতলার ড্রয়িংরুম। খুব সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো। বিশাল বড় একটি মাটির ফ্লাওয়ার ভাস। সরস্বতীর বড় মূর্তি। তার পাশের দেওয়াল জুড়ে নানা ধরনের ছবি। ছোট বড় ফ্রেম। বেশিরভাগ ছবিই অমিত্রসূদনের ছেলে আর্যনীলের। দু-একটা ছবি অমিত্রসূদন আর শকুন্তলার অল্প বয়েসের। সাদা কালো বা শখ

করে সিপিয়া। শকুন্তলা নিজের এখনকার ছবি রাখে না। কেননা শকুন্তলার মনে হয়, ওর চেহারা বড্ড ভেঙে গেছে। ফলে আর্যনীলের অনেক অনেক রঙের মাঝে ওদের সাদা কালো ছবিগুলো নস্টালজিক ছোঁয়ায় মানিয়ে যায়। মাঝে নাটকের সাজে অমিত্রসূদনের কয়েকটা ছবি শকুন্তলা লাগিয়েছিল। অমিত্রসূদন নিজে সেটা খুলে দিয়েছে।

'আর্যনীলের একদম রিসেন্ট টাইমের ছবি কি এখানে আছে?' দেবেশ বলল।

'এখনকার ছবি?' অমিত্রসূদন হাতড়ায়। এই ছবিগুলো তো প্রায় সবই আর্যর। কিন্তু এখনকার ছবি? এখনকার আর্য কেমন? মনে হয় যেন কতকাল ছেলেকে দেখেনি।

'হ্যাঁ, এই ধরুন মাস ছয়েকের মধ্যের কোনও ছবি?'

ওরা দেখছে, ওরা খুঁজছে। অমিত্রসূদনও ছবির ফ্রেমগুলোর দিকে তাকাল। সব ছবিই বেশ পুরনো। মানে শেষ যে ছবিটা দেখছে, সেটা আইএসসি পাশ করার সময়কার। সে ঘাড় নাড়ল। 'না, এখনকার কোনও ছবি দেখছি না। নেই।'

'আমাদের কাছে আছে। দেখুন। এই তো আর্যনীল দাশগুপ্ত—আপনার ছেলে?' সামনের একজন পকেট থেকে মোবাইল বের করে আর্যনীলের একটা ছবি অমিত্রসূদনের কাছে মেলে ধরল। তার কাছেও মোবাইলে ওদের মা ছেলের কত ছবি আছে।

অমিত্রসূদন দু'চোখ মেলে দেখল নারকোটিক্স সেলের একজন পুলিশের মোবাইলে তার ছেলে জ্বলজ্বল করছে। এই তো তার ছেলে, একমাথা ঝাঁকড়া চুল। উজ্জ্বল চোখ, ডিম্বাকৃতি মুখ। মুখে হালকা দাড়ি। শকুন্তলার মুখ পেয়েছে আর্য। কথায় বলে, মাতৃমুখী ছেলেরা সুখী হয়।

'এই ছবি—কী আপনার ছেলে তো?' ঠান্ডা গলায় দেবেশ বলল।

'হ্যাঁ আমার ছেলে।'

'ভালো করে দেখুন।'

একটু চমকে উঠে অমিত্রসূদন মোবাইলের ভেতর আর্যনীলের ছবিটার দিকে তাকাল। সমস্ত চেনার মাঝে আর্যর ছবিটা কেমন যেন অচেনা লাগল। দু'চোখে উজ্জ্বলতা নেই, কেমন ম্লান। মনে হল সে অনেকদিন আর্যকে দেখেনি। আর্য যেন অনেক অনেক পালটে গেছে। ওর চোখ মুখ কেমন রাগী না ক্ষুব্ধ ভাব। এই বয়েসের ছেলেদের মুখগুলো এমনই হয়, রাগী রাগী! রাগী! ক্ষুব্ধ? নাকি বিষণ্ণতা মাখানো।

'আর্যর পুরো নাম কী?'

'আর্যনীল দাশগুপ্ত।'

'ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করেছিল।'

'হ্যাঁ। আইসিএসই, আইএসসি—দুটোতেই। জয়েন্টেও।'

'হ্যাঁ, ওর তো মাধ্যমিক নয়, দিল্লি বোর্ড।'

'এখন সেকেন্ড ইয়ার।'

'নামী স্কুল, ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট।' দেবেশের পাশেরজন নিজের মনে মনে বিড়বিড় করে, 'ওরা ভালো ছেলেগুলোকে সব খোকলা করে দেবে স্যার। স্লো পয়জন চলছে!'

ড্রয়িং রুমের ভেতর ঢুকে দেবেশ আর তার সহকর্মী নিজেদের মতো করে বসে পড়েছে। অমিত্রসূদন প্রথমে দাঁড়িয়েছিল, ওদের একজন বলল, 'এ কী আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন।'

অমিত্রসূদন ধপ করে বসে পড়ল।

দেবেশ বলল, 'আমরা কেন এসেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? আপনার ছেলে আর্যনীল ঠিক পথে নেই। উচ্ছন্নে গেছে। কতটা কী গেছে, তার খোঁজ করতেই আমরা ঘুরছি।'

পুলিশের গাড়ি। নারকোটিক্স শুনে অমিত্রসূদন এই আশঙ্কাই করেছিল। সন্দেহ। তাই সে এদের দেখে আশ্চর্য হলেও মুহূর্তে নিজেকে শান্ত করেছিল। গেটের মুখে ওদের দেখেও সে আর পাঁচজনের মতো আঁতকে উঠে হইচই করেনি। কিন্তু বুকের ভেতর ধক ধক করেই চলেছে। সে ধক ধক এখনও চলছে। কবে কখন শুরু হয়েছিল তার মনে নেই। সে বলল, 'বলুন, আমি কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?'

'আপনার ছেলের ঘরটা একবার দেখতে চাই।' শান্ত গলায় দেবেশ বলল।

'আসুন।' অমিত্রসূদন উঠে দাঁড়াল। তবে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না।

'আমাদের কাছে কিন্তু কোনও সার্চ ওয়ারেন্ট নেই।' দেবেশ ঠান্ডা গলায় বলল।

'দরকার নেই। আমি জানি আপনারা আমার ভালো চান।' অমিত্রসূদন ডানদিকের একটা ঘরের দিকে পা বাড়াল।

'তার আগে একটু জল খাওয়ান।' দেবেশের পাশেরজন বলল। 'অনেকক্ষণ আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।'

'চা খাবেন? বেশি সময় লাগবে না।'

'না, না, স্যার। পুলিশে ছুঁলে আঠেরো ঘা, আর আপনি পুলিশকে যেচে চা খাওয়াচ্ছেন! চলুন ঘরটা দেখি।' দেবেশ হাসল।

ওপরে তিনটে ঘর। তারমধ্যে একটা বইপত্রে ঠাসা, পড়ার ঘর। দু'দিকে দুটো শোওয়ার ঘর। একটা তাদের, আর একটা আর্যনীলের।

'এটা আর্যনীলের ঘর।'

তিনজনে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। আপাত শান্তশিষ্ট একটা ঘর। কিন্তু অমিত্রসূদন জানে এই ঘরের চারদিকে ছড়ানো আছে অশান্তির নানা চিহ্ন। ওই যে হালকা আকাশ-নীল রঙের দেওয়াল, ওই দেওয়ালের দিকে ভালো করে তাকালে দেখা যাবে ক্ষত বিক্ষত নানান দাগ। ওই দেওয়ালের গায়ে আছড়ে ফেলা হয়েছে, ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, ওই দেওয়ালকে অবলম্বন করে ভেঙে ফেলা হয়েছে অনেক কিছু। অনেক শাস্তি, অনেক সুখের ছাপ আছে এই ঘরটাতে।

ওরা ঘরে ঢুকেই পড়ার টেবিলের ড্রয়ার খুলে হাত ঢোকাল। সামনে স্টিলের আলমারি। পাল্লা খোলা। ওরা আলমারির পাল্লা খুলে ভেতরে হাত চালিয়ে দিল। আলমারির পাল্লার গায়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি কয়েকটা। আর্নিকা থার্টি। রাসটক্স থার্টি।

'ও হোমিওপ্যাথি ওষুধ খায় নাকি? কে কিনে দেয়?'

'ওর মা আগে ওকে হোমিওপ্যাথি খাওয়াত। আমরা সবাই খাই।'

'ওষুধগুলো ওর ঘরেই রাখেন?'

'তাই তো থাকে। আসলে পুরো বাড়িটাই সবার, আলাদা করে শুধু নাম দেওয়া হয়েছে।'

অমিত্রসূদনের কথায় দেবেশ মুখ তুলে তাকাল।

ওরা সব শিশিগুলো তুলে নিয়ে নাড়ল। নাকের কাছে এনে দু'জনে শুঁকল। একটা খুলে দু-একটা গুলি মুখে ফেলল। বিছানার গদি তুলে নীচের দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে দেখল। না, ঠিকই আছে। দেবেশের পাশেরজন বড় একটা টর্চ জ্বালিয়ে খাটের নীচে দেখল। ধারগুলো দেখল।

'না, ঠিকই আছে। ভালো ছেলে। খারাপ বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়েছে—কতটা পড়েছে আমাদের জানতে হবে। ইদানীং কি ও রাত করে বাড়ি ফেরে?'

'রাত করে? না!'

'হঠাৎ করেই স্বাভাবিক আচরণে কোনও পরিবর্তন দেখেছেন? যেমন, অন্যমনস্ক থাকছে, বা সামন্য কিছুতে অস্থির হয়ে চিৎকার, চেঁচামেচি করছে? ঘর অন্ধকার করে জোরে মিউজিক শুনছে? বাথরুম টয়লেটে আগের চেয়ে বেশি সময় কাটানো? আগের মতো খাচ্ছে-দাচ্ছে? না, কমে গেছে?'

'এগুলো ওর মা বলতে পারবে। কিন্তু আমার চোখে কোনও অস্বাভাবিক কিছু পড়েনি।'

'অসময়ে ঘুমায়?'

'সারা রাত জেগে পড়াশোনা করে, কিছুটা তো অসময়ে ঘুমায়ই।'

'নতুন অপরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করছে? বাড়তি টাকা চাইছে?'

'না।'

'এর মধ্যে বাড়ি থেকে টাকা পয়সা, গয়নাগাটি কিছু হারিয়েছে?'

'না।'

'কাল ওকে লালবাজারে নিয়ে আসুন।'

'লালবাজার!'

'লালবাজার নারকোটিক্স সেল। কিন্তু আপনি আসবেন কেআইটি বিল্ডিং সিক্সথ ফ্লোর। আপাতত ওখানেই নারকোটিক্স সেলের অফিস। কাল আবার আমি থাকব না। বড়বাবু থাকবেন। আর্যনীলকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসবেন। আপনারা দুজন দেখা করুন। বারোটা নাগাদ।'

দেবেশ হাত বাড়ায় হ্যান্ডশেক করার জন্য। অমিত্রসূদন হাত বাড়িয়ে বলে, 'ও কি কিছু অন্যায় করেছে? বড় কোনও অপরাধ?'

'না, তেমন নয়। টেনশন করবেন না। তবে হ্যাঁ আমাদের যখন এতটা খোঁজ খবর করতে হয়েছে, এতটা ছুটে আসতে হয়েছে তখন কিছু তো করেছে। ওর নাম আছে আমাদের খাতায়। বুঝতেই পারছেন সেটা ভালো নয়। দেখা যাক। আর হ্যাঁ, ও ফিরলে রাগারাগি বা অশান্তি করবেন না, প্লিজ। আমরা ওর ভালো চাই। ও স্টুডেন্ট। ভালো

স্টুডেন্ট। ওর কোনও ক্ষতি হোক আমরা চাইব না। ওকে নিয়ে আসুন। ওর সঙ্গে কথা বলি। আর একটা কথা, এই আমরা এসেছিলাম, মানে, আমরা পুলিস। পুলিশের গাড়ি দেখে যদি কেউ প্রশ্ন করে বলবেন পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন করতে এসেছিল। কেননা আপনাদের পাশের ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক আমাদের ওয়াচ করছিলেন। একবার এসে আমাদের জিগ্যেসও করেছেন। তিনি নির্ঘাত জানতে চাইবেন। ওকে শান্ত করার ওষুধ দিয়ে গেলাম পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন। কাল দেখা হবে।'

দেবেশরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে অমিত্রসূদন। সে নড়তে পারে না। তরুণ কোনও নাট্যকর্মী এলে দেবেশ নীচের দরজা পর্যন্ত নেমে যায় তাকে বিদায় জানাতে। আজ সে সিঁড়ির ওপর কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সে দেখল ঝুপসি অন্ধকারে গাড়িটা নড়ে উঠল। আর গাড়িটার আওয়াজ যেন অনেকটাই ষাঁড়টার গর্জনের মতো হয়ে উঠেও দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দের মতো বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল।

অমিত্রসূদন নীচের দরজা বন্ধ করল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবল কী করবে সে? সামনে বিশাল একটা অন্ধকারে ডোবা মঞ্চ। সে দাঁড়িয়েই থাকল। দৃশ্য শেষ। চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেছে। নিজেকেও দেখা যাচ্ছে না।

অমিত্রসূদন কি হাততালির আশা করছিলেন?

তিন

দারাসিংয়ের গরর গরর গর্জন আসছে রাস্তার বাঁক থেকে।

সন্ধেবেলা পুলিশের গাড়িটা যখন গেল ঠিক এরকম ষাঁড়ের মতোই গররর গররর করে গর্জন করছিল। হঠাৎই এক খাবলা শব্দমাখা হাওয়ায় ষাঁড়ের গর্জনকে শিবনাথের পুলিশের গাড়ির গর্জন মনে হল। কেন মনে হল? এমন বিভ্রম কী হয়? সে আধঘুমন্ত প্রমীলার কাছে গেল সন্ধের না-বলা কথাটা বলার জন্য।

আসলে শিবনাথ ঠিক বারোটার সময় দাঁত মাজে। রোজকার মতো আজও সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরে রাস্তার ওই বাঁকে দারাসিংয়ের সেই বিপুল গর্জন ও বিশাল বপুর আভাস পেল। তার মুখের ভেতর ব্রাশ আটকে। যতখানি নিয়মমাফিক উপর-নিচ, উপর-নিচ করে দাঁত মাজার কথা ছিল, তা থেমে গেছে। কিন্তু গলার ভেতর পেস্ট ঢুকে হঠাৎ তার ওঁক উঠে এল। শিবনাথ দাঁত মাজতে মাজতে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিকে দেখে চিরিক করে থুতু ভরা ফেনা রাস্তায় ফেলত। তবে এখন সে এই বদঅভ্যাসটা ত্যাগ করেছে। কারণ রাত বারোটার শো দেখতে এখন অনেকেই বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আপাতত সে বারান্দা থেকে দৌড়ে বাথরুমের বেসিনে মুখের ভেতরকার জমা ফেনা উগরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। তখনই তার নজর পড়ল পাশের বাড়ির অমিত্রসূদনের দিকে।

শিবনাথ ব্রাশটা হাতে নিয়ে দারাসিংয়ের গর্জন না-অনুসরণ করে এখন অমিত্রসূদন আর শকুন্তলাকে দেখছিল। ডাল মে কুছ কালা হ্যায়! শিবনাথ বিড়বিড় করল।

আগের শনিবার পুলিশের গাড়িটা এই বাড়ির কাছে এসে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল। শিবনাথ যাওয়ার সময়ই দেখেছিল, বোর্ড লাগানো আছে—পুলিশ! প্রথমে একটু ঘাবড়ে

গিয়েও সে গাড়ির ভেতর তাকিয়েছিল। গাড়ির ভেতর জনা তিনেক লোক বসে। নিশ্চুপ, যেন পাথর! তিনজনই রাস্তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে।

পুলিশ অপেক্ষা করছে? নিশ্চয়ই কোনও গন্ডগোল। কিন্তু সেটা কী শিবনাথ ঠিক আন্দাজ করতে পারছে না। তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফিরে সে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। নজর গাড়িটির দিকে, একটু পরে গাড়িটি চলে যায়। যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে যাচ্ছে।

শিবনাথ ঘরের ভেতর ঢুকে প্রমীলাকে আলতো গলায় বলল, 'ব্যাপারটা কী হল বুঝলাম না, শনিবার একটা পুলিশের গাড়ি এসে অমিত্রবাবুদের গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। আজ আবার এসেছিল। কেন এত পুলিশের গাড়ির আনাগোনা—ঠিক ক্লিয়ার হল না।'

প্রমীলা বলল, 'উনি তো নাটক করেন। দেখো বড় হোমড়াচোমড়া কেউ ওদের বাড়িতে এসেছে।'

'না, না, ওরা বাড়ি ছিল না।'

প্রমীলা কপাল কুঁচকে শিবনাথের দিকে তাকাল।

শিবনাথ বলল, 'নাটকের লোক বলেই তো গোলমাল। নাটকের লোকগুলো দেখবে খুব রাজনীতি করে। কিছু হলেই ওরাই সব্বার আগে প্রতিবাদ করে, রাস্তায় নেমে পড়ে, হইচই বাধায়। তেমন কিছুর সঙ্গে জড়িয়েছে নির্ঘাত। পার্টি পলিটিক্স। পুলিশ এসে মাপছে, দেখবে কবে এসে ঘাড় ধরে তুলে নিয়ে যাবে।'

প্রমীলা বলল, 'উনি কি এত বড় কিছু? তবে হ্যাঁ একবার টিভিতে দেখেছিলুম বটে, কী একটা নিয়ে খুব ঝগড়া করছিল।'

'ঝগড়া নয় ডিবেট! না, না, উনি তেমন কিছু না। হলে পাড়ার সবাই টানাটানি করত। ইদানীং কোনও দলে ভিড়েছে হয়তো। এবার পুলিশের ক্যালানি খাবে।'

'আঃ!' প্রমীলা বিরক্তি প্রকাশ করল। 'তোমার মেয়েকে জিগ্যেস করো, ও জানে। আর্যর সঙ্গে তো ভাব আছে।

এখন আবার শিবনাথ সন্ধের কথাটা তুলতে চেয়েছিল।

প্রমীলা বলল, 'রাত বারোটার সময় তুমি ষাঁড় দেখতে বেরিয়ে পুলিশের গাড়ি দেখছ?'

শিবনাথ ষাঁড় দেখবে বলেই দাঁড়িয়ে, ও-বাড়ির বারান্দায় অমিত্রসূদনকে দেখছিল।

ষাঁড় আসবে, এক সময় চলেও যাবে। কিন্তু শিবনাথ দাঁড়িয়ে থাকবে।

এখান থেকে শিবনাথ সিক্সটিন—বি ফ্ল্যাট বাড়িটা দেখতে পায়, কিন্তু মল্লিকবাবুর ফ্ল্যাটটা দেখতে পায় না। ওই ফ্ল্যাটে তিনটে মেয়ে আছে, মল্লিকবাবুর পেয়িং গেস্ট। আর উলটো দিকে দেখো, বারান্দায় শোভন কেষ্টঠাকুর হয়ে দাঁড়িয়ে, একটুও লজ্জা নেই। মল্লিকবাবু ওদের বাড়ি গিয়ে স্পষ্টভাষায় বারণ করে এসেছে—তার ফ্ল্যাটের দিকে যেন না তাকায়। অথচ সেই সাড়ে এগারোটা থেকে ষাঁড় দেখার বাহানা দিয়ে শোভন বারান্দায়!

আর তেমন হয়েছে ডাঃ যোগেশের ছেলে দুটো, যেন ষাঁড় এলে শ্যুটিং করবে, ষাঁড় কখন আসবে তার আগেই মোবাইল নিয়ে বারান্দায় হাঁক ডাক করছে। বউ তো পটের বিবি! ছেলে দুটোকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে যোগেশ মাথায় তুলেছে।

এভাবেই শিবনাথ তার চারপাশের ভেতর জেগে থাকবে, রাত প্রায় সাড়ে বারোটা পর্যন্ত। ওই সময় তাদের ফ্ল্যাটবাড়ির গেটে এসে দাঁড়াবে সেবন্তীর গাড়ি। সেবন্তী তাদের

একমাত্র মেয়ে। খুব জেদি। একটা চ্যানেলে আছে। চাকরিটা শিবনাথ ঠিক মেনে নিতে পারে না। সেবন্তীর শ্বশুরবাড়িও মেনে নিতে পারেনি, সাত বছরের প্রেমিক রাঘব বিয়ের পর এই চ্যানেলের চাকরিটা নিয়ে ঝামেলা করছে। সেবন্তী এখন বাপের বাড়িতে থাকে। রোজ রাতে শিবনাথ মেয়েকে বোঝায়। আর মেয়ের যেন ষাঁড়ের গোঁ।

প্রমীলা বিছানায় শুয়ে। বাতের ব্যথায় বেশ কাতর। নড়তে চড়তে আঃ উঃ করছে। ব্যালকনিতে আলো নিভিয়ে শিবনাথ দাঁড়িয়ে। সে এই আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে টের পাচ্ছে, পাশের ফ্ল্যাটের অঘোর বিশ্বাস ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। লোকটা ঠিক সুবিধার নয়। না জানি প্রমীলার আঃ উঃ শুনে কী না কী ভাবছে! শিবনাথ ঘরের ভেতর ঢুকে চাপা গলায় প্রমীলাকে বলল, 'আঃ উঃটা একটু কম করো। লোকে কী ভাববে!'

'কী ভাববে? তোমার ঘরে নতুন বউ এসেছে!'

নতুন বউ কথাটা শুনে শিবনাথ কেমন আনমনা হয়ে গেল, পরক্ষণেই দাবড়ে উঠে বলল, 'না আমার ঘরে একটা ষাঁড় ঢুকে কাউকে ঢুঁসো মারছে।' বিরক্তিতে শিবনাথ জবাব দিল। সে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সামনের রাস্তা, রাস্তা থেকে ছোট ছোট গলিপথ গুলো একা একা পড়ে আছে। লাইটপোস্টের আলোও বড় ম্লান এই জায়গাটায়। এই সময়টায় সবাই যে যার মতো ঘরে ঢুকে যায়। একটা দিন শেষের, একটা আরামের, নিশ্চিন্ত ঘুমের অপেক্ষা করে। অথচ শিবনাথকে দেখো, মেয়ের জন্য হাঁ করে রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকতে হয়। মেয়ে যেন চাকরি করে তার মাথা কিনে নিচ্ছে।

সেবন্তীকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছে শিবনাথ। বলেছে, 'তুই অন্য কোনও জব দেখ।'

'অন্য কোনও জব কেন?'

এই মাঝরাতে ফেরা। কিংবা সারারাত বাড়ির বাইরে কাটিয়ে ভোরবেলা ফেরা, এই নিয়েই তো রাঘব আর ওর বাড়ির লোকের আপত্তি। শিবনাথ বলল, 'জবের ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ করলেই তোরা একসঙ্গে থাকতে পারিস।'

'আমি একসঙ্গে থাকতে চাই না।' সেবন্তীর কাটা কাটা উত্তর।

'একসঙ্গে থাকবি না তো কী করবি? মেয়েছেলে স্বামী-শ্বশুরঘর করবি না? আর তোকে কাজ করতে হবে না।' প্রমীলা ওদের দুজনের শান্ত কথার মাঝে বাঁকা কথা বলে ফেলে। আর তাতেই ঘৃতাহুতি।

'মেয়েছেলে ব্যাটাছেলে কোরো না। আমার জবের নেচার জেনেই রাঘব আমাকে বিয়ে করেছে। এখন বিয়ের পর বাপ মায়ের কথা শুনে ন্যাকা ন্যাকা কথা বললে আমি শুনব কেন?'

শিবনাথ সমঝোতা করার চেষ্টা করে। 'আহা এই চাকরি ছাড়বি, অন্য চাকরি করবি। এই তো শুনি দু'মাসের মাইনে বাকি। তোদের চ্যানেল ধুঁকছে। ওরা তোকে চাকরি করতে বারণ করছে না। কিন্তু মধ্যরাতে বাড়ির বউ গাড়ি থেকে নামবে, সারারাত বাড়ির বাইরে থাকবে কেমন একটা দেখায় না?'

'না, দেখায় না। আমি কাউকে দেখানোর জন্য চাকরি করতে যাই না। যারা দেখবে সেটা তাদের সমস্যা—আমার নয়।'

'তুই বরং রাঘবকে ডেকে একদিন কথা বল।'

'কথা বলার কিছু নেই। ওর বাবা মা রোজ ঘ্যান ঘ্যান করছিল। আমি একদিন স্পষ্ট করে ওনাদের বললাম, আপনার ছেলে আমাকে সাত বছর ধরে চেনে। আমি কী জব করি জানে। জেনেই বিয়ে করেছে। যদি কিছু বলতে হয় ছেলেকে গিয়ে বলুন। আমাকে কিছু বলবেন না। আমি লুকিয়ে বিয়ে করিনি।'

'তাহলে আমি কী বলব রাঘবকে?'

'তুমি আমার কথা থেকে যা বুঝলে সেটাই বলবে। আমি কি যা বলছি, সেটা স্পষ্ট নয়। ওদের কোনও শর্ত আমি মেনে নেব না।'

'জেদাজেদি করিস না মা।' প্রমীলা বলল।

'আমি কেন ফালতু ওদের সঙ্গে জেদাজেদি করব। আমি আমার মতো থাকি। আমি তো ওদের নিয়ে টানাটানি করছি না। ওরা কেন আমাকে নিয়ে এমন টানাটানি করছে? থাকুক না ওরা নিজেদের মতো।' সেবন্তী ওর কথা শেষ করে দেয়। ঘর থেকে চলে যেতে যেতে সেবন্তী বলল, 'আজ রাতে দারাসিং এসেছিল? কী করল? আজ কার ফাটাল?'

ওরা কেউ কোনও উত্তর দিল না। শিবনাথের মুখে এসে গিয়েছিল, আর ষাঁড়ের রগড় দেখতে হবে না, তুমি যথেষ্ট রগড় করছ। বুঝবে, বুঝবে জীবন নিয়ে এমন রগড়ারগড়ি করতে নেই। একদিন ছালবাকলা সব উঠে যাবে। তখন কেমন জ্বালা টের পাবে। মলম দিয়েও সারবে না।

সেবন্তী ফিরলে শিবনাথ শুয়ে পড়ে। তার কাজ শেষ। ব্যালকনির দিকের দরজা বন্ধ। পারতপক্ষে আর ব্যালকনি খোলে না। একদিন খুলে বেইজ্জত হয়েছে। ওইসময়ে ও-ঘরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায় সেবন্তী। পর পর খান দুয়েক সিগারেট খায়। কানে হেডফোন গুঁজে গান শোনে।

আজ সিগারেট ধরিয়ে সেবন্তী দেখল, অমিত্রআঙ্কেল আর শকুন্তলাআন্টি ব্যালকনিতে অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে। কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছে না। আর্যনীল কি এখনও বাড়ি ফেরেনি? না, ওই তো আর্যনীলের ঘরে আলো জ্বলছে। আলো জ্বলছে, কিন্তু কোনও মিউজিক ভেসে আসছে না। ব্যাপারটা কী হল, কোনও প্রবলেম? কারও অসুখবিসুখ নয়তো?

সেবন্তী আর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেল না।

না, শকুন্তলাআন্টি অবশ্য মায়ের মতো প্রাচীনপন্থী নয়, যে তাকে সিগারেট খেতে দেখলে আঁতকে উঠবে। তবু সেবন্তীর কেমন যেন একটু অস্বস্তি হল। সে সিগারেটটা আর ব্যালকনিতে ধরাল না। ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর অ্যাসট্রেটা টেনে নিয়ে বসল।

ওদিকের জানলাটা খুলে দেবে কি?

আগে এই জানলাটা খোলা থাকত। ইদানীং সে বন্ধ করে দিয়েছে। আসলে বন্ধ করেছে সে উত্তমদার জন্য। উত্তম, উত্তম দাস। আগে সিপিএম করত। লোকটা যতদিন সিপিএম করত, একরকম ছিল। ভোটের আগে আগে ঠিক দেখা করে বলে যেত—ক্যান্ডিডেট কে, আর কোথায় ছাপ মারতে হবে। পারলে যেন হাতে ধরে ভোটটা দিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে

মনে করিয়ে দিত, কংগ্রেস আমল কী ভয়াবহ ছিল। সেবন্তী হিসেব করত, উত্তমদার যা বয়েস সে কি কংগ্রেসি আমল দেখেছে? বড়জোর সে সময় বড় হয়েছে। কিন্তু সেই বামপন্থী লোকটা ইলেকশনের বছর খানেক পরেই দল পালটে ফেলল। সেবন্তীর মনে হয়, উত্তমদা শুধু দল পালটায়নি নিজেকেও পালটে ফেলেছে। এখন নাকি উত্তমদা এখানকার কাউন্সিলারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। হেব্বি ক্ষমতা রাখে। এখন সিন্ডিকেট চালায়। রাত হলেই উত্তমদা নিত্যদিন প্রচুর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে। রোজ রোজ নাকি তার মনে হয়, কেউ তাকে মারবে। তার ভালো কেউ দেখতে পারছে না। সবাই তার শত্রু। সেবন্তীর মনে হয় উত্তমদা যেন নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করে। দু'দিন ছাড়া ছাড়া বউ মেয়েকে ধরে ঠ্যাঙায়। আবার মাঝে মাঝে বউকে নিয়ে লং ড্রাইভে যাওয়ার জন্য একটা গাড়ি কিনেছে, এখন অবশ্য শুধু বিয়ে বাড়ি যায়। দারাসিং কদিন আগে এসে শিংয়ের গুঁতোয় সেই গাড়িটার পিছন দিকে বেশ খানিকটা তুবড়ে দিয়ে গেছে।

কাল প্রমীলা বলছিল—বুঝলি, উত্তম এখন ক'দিন বউ পেটাচ্ছে না, ও ষাঁড় ঠ্যাঙানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

'গ্রেট, দারাসিং তাহলে একটা হলেও ভালো কাজ করেছে বলো! ওই বাড়ির ঝামেলা থামিয়ে দিয়েছে।'

চার

অমিত্রসূদন চুপ করে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। একটু পরেই শকুন্তলা ফিরে এল। আজ শকুন্তলাকে দেখেও যেন অমিত্রসূদন দেখতে পেল না।

বাড়ি ঢুকে শকুন্তলা বলল, 'কী গো দরজাটা এমন হাট করে খোলা কেন? কেউ এসেছিল?'

অমিত্রসূদন হ্যাঁ না-এর মাঝে কেমন একটা অস্ফুট শব্দ করল, যা শকুন্তলার শোনার মতো ধৈর্য নেই। সে দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। শকুন্তলা পিসশাশুড়ির জন্য হালকা কিছু খাবার নিয়ে যায়, সেই সব ব্যাগপত্তর টিফিনকৌটো সিঙ্কে রেখে হাত মুখ ধুয়ে এল। এসে বলল, 'চা খেয়েছ? চা করছি।'

এ-বাড়িতে কারণে অকারণে চা খাওয়ার রেওয়াজ। শকুন্তলা চা করে নিয়ে এসে বসল। তার চোখে মুখে পিসশাশুড়ির বাড়ি যাওয়া আসার ধকল লেগে আছে। আসলে সে খুব দ্রুত এগুলো করতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। নাহলে কত দূরেরই বা পথ। একবার ছেলের ঘরের দরজার দিকে তাকাল। আর্য নেই। দরজা হাট করে খোলা। আর্য বাড়ি থাকলে ওই ঘরের দরজা বন্ধ থাকত। আর তাকে এককাপ চা বেশি করতে হত।

অমিত্রসূদন এখনও সকালের পরে যাওয়া জামা কাপড়েই বসে। একটু অবাক হল শকুন্তলা। বলল, 'তুমি কোথাও বেরুবে? চেঞ্জ করোনি?'

অমিত্রসূদন সে-কথা শুনেও শুনল না। বলল, 'তোমার ছেলে কখন ফিরবে?'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শকুন্তলা বলল, 'এবার এসে যাবে। আজ তো সোমবার।'

অমিত্রসূদন জানে না সোমবারের আলাদা কী মাহাত্ম্য আছে? আজ যদি সোমবার না হয়ে অন্য কোনও দিন হত তবে কি ওর বাড়ি ফিরতে আরও দেরি হত? নাকি আগে ফিরত?

আর্যনীলের যাবতীয় খবর রাখে শকুন্তলা। আর্য ওর মায়ের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ। যত কথা, বন্ধুত্ব। তাহলে কি অমিত্রসূদন তার একমাত্র সন্তানের থেকে অনেক দূরবর্তী হয়ে পড়েছে? অমিত্রসূদন দেওয়ালে টাঙানো আর্যনীলের ছবির দিকে তাকাল। না, ছবির সঙ্গে এখন আর তেমন মিল নেই আর্যর। এখন ওর একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। মাঝে মাঝেই শোনে এই চুল কাটা নিয়ে মা আর ছেলের নানা তর্কবিতর্ক! প্রথমত, আর্যনীল চুল কাটতে চায় না। দ্বিতীয়ত, চুল কাটতে বললে এমন সব জায়গা, এমন সব পার্লারে গিয়ে চুল কাটতে চায়, যেখানে মিনিমাম ৩০০ টাকা লাগবে। আর্য পাড়ার সেলুনে যাবে না। ওর বন্ধুরা এখানে চুল কাটে না। শকুন্তলাও ৫০ টাকার বেশি দেবে না। মা আর ছেলের তাই মাঝে মাঝেই চুলকাটা নিয়ে দড়ি টানাটানি চলে।

ইদানীং আর্যর দিকে তাকালে তার অস্বস্তি হয়। রোগা রোগা চেহারা আর্যর মাথায় এত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের জন্য ওকে খুব খারাপ দেখতে লাগে। সে একদিন বলতে গিয়েছিল, আর্য অদ্ভুত চোখে তার বাবার দিকে তাকাল। বলল, আমার স্টাইল তোমরা ঠিক করে দেবে? আমি কি বাচ্চা?

অমিত্রসূদন নিজেকে সামলানোর গলায় বলল, ‘না, স্টাইল নয়। ক্যারি করাটা আসল কথা। তুই বড্ড রোগা। এত বড় বড় চুল তোকে ঠিক মানায় না।’

কথাটা বলে সে চলে আসছিল। হঠাৎ পিছন থেকে আর্য ডাকল। বলল, ‘এক সেকেন্ড, কথা বলতে বলতে হঠাৎ চলে যাও কেন? এদিকে এসো, দেখে যাও। আমি ক্যারি করতে পারি না—তাই তো! দেখো।’

‘কী দেখব?’

‘এসো, ক’টা ছবি দেখাচ্ছি। আমার বন্ধুদের।’

অমিত্রসূদন অনিচ্ছুক পায়ে এল। আর্য ওর চোখের সামনে তার হাতের মোবাইলটা মেলে ধরল। ‘এই যে এর নাম অগ্নিপুত্র। চুল দাড়ি দেখো! এর ফিগার কী আমার থেকে ভালো? এর নাম সন্দর্ভসেন। এর চুল দেখো। মাথার ওপর দিকে সামান্য একটু আছে। আর এই মেয়েটা। ঋতম্ভরী। ভালো করে দেখো। না দেখলে বুঝতে পারবে না। ওর একদিকে ছেলেদের মতো জুলপি করে, হাফ ঘাড় ছেঁটে, চুল কাটা। অন্যদিকে মেয়েদের মতো।’

‘তুই এদের কেন দেখাচ্ছিস?’

‘বাবি প্লিজ তুমি মায়ের মতো হয়ো না। তুমি নাটক করো, মায়ের মতো হলে সময়টাকে ধরবে কীভাবে? আর মাকে বলে দিও, আমি তোমাদের জেনারেশনের নই। আমরা আমাদের মতো—আমরা তোমাদের মতো নই।’

অমিত্রসূদন ছেলের ঘরের দিকে তাকায়, গিটার ঝুলছে। হ্যাঙ্গারে টিশার্ট, বেল্ট, টুপি, ছেঁড়া ফাটা জিনস, স্কেল, বক্স। দেওয়ালে চে থেকে রকস্টার। পড়ার টেবিলে বিছানায় উপচে পড়ছে বই। যত না পড়ার বই তার থেকে বেশি বিশ্বসাহিত্য। এগুলোর পাশেই দেওয়ালে মাঝে মাঝে গর্ত। স্পষ্ট আঘাতের চিহ্ন। কোনও না কোনও সময় আর্য এখানে তার ক্ষোভ, রাগ প্রকাশ করেছে। হাতের সামনে যা পেয়েছে তাই ছুড়ে মেরেছে। ক্রিকেট

ব্যাট দিয়ে মেরেছে। হাতের মোবাইল ছুড়ে ভেঙেছে। আরও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ঘরের দরজার লক ভাঙা।

লক ভাঙা হয়েছে কোনও যান্ত্রিক গোলমালের জন্য নয়। ভেঙে দেওয়ার কারণটি ভিন্ন। আর্য কোনও কিছু নিয়ে মতপার্থক্য হলেই ঘরের দরজা ভেতর থেকে আটকে দিত। এক মারাত্মক টেনশনের খেলা। অনেকদিন এমন হয়েছে, সামান্য বকাবকি হলে আর্য ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা দিয়েছে। তারপর সেই বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শকুন্তলার কাকুতি মিনতি, ক্রমশ কান্নাকাটি। তখন আর্য দরজা খুলল হাসতে হাসতে। ব্ল্যাকমেল! কোনও কোনও সময় এই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে অমিত্রসূদনও। প্রতিটি মিনিট যেন অনন্তপ্রহর। বুকের ভেতর টনটন করে উঠত।

একদিন স্কুলে পেরেন্ট টিচার মিটিং-এ অন্য এক স্টুডেন্টের মা ঠিক এই-কথাটাই তুলল। স্কুল প্রিন্সিপাল সহজ সমাধান দিলেন ছেলের ঘরে লক রাখার দরকার কী? কাল মিস্ত্রি ডেকে লক খুলে দিন। প্রবলেম সলভড। শকুন্তলা হাতে চাঁদ পেয়েছিল। যেদিন লক খোলা হল, আর্য সেদিন রাগে জানলার কাচ ভেঙে দিল। অমিত্রসূদন বলল, আমি সারাব না। শীত বর্ষা! দু-পক্ষই জেদ ধরে থাকল। কিন্তু ডেঙ্গু! পাড়ায় ডেঙ্গু হতেই দু-পক্ষই শান্তি ঘোষণা করল।

এসময়, প্রিন্সিপাল স্যার আরও বলেছিলেন, আরও কথা। তার কোনওটা শকুন্তলার মনঃপুত হয়েছে, কোনওটা হয়নি। কিন্তু মুখ বুজে শুনেছে। যেমন হয়নি—ওকে একটা স্মার্টফোন কিনে দিন। শকুন্তলা বলতে চেয়েছিল, আছে তো। আমার একটা পুরনো ফোন ও ইউজ করে। কিন্তু প্রিন্সিপাল স্যার বললেন—না। স্মার্টফোনে শুধু কল আসা বা যাওয়া নয়। ওটা একটা দুনিয়া। গোটা দুনিয়া। ম্যাম আপনার ছেলে পিছিয়ে পড়বে। হীনম্মন্যতায় ভুগবে। শকুন্তলা অবাক হওয়া গলায় বলেছিল, আপনি স্মার্টফোন কিনে দিতে বলছেন? হ্যাঁ বলছি। আমি তো প্রিন্সিপাল আপনার কাছে। আর ওদের কাছে ওদের টিচার, ফ্রেন্ড, কখনও স্টুডেন্টও। আপনার কিনে দেওয়া ফোনটা আমি স্কুলে দেখলে ওকে প্রচণ্ড বকব। আপনাকে ডেকেও বলতে পারি, না, না, এই বয়েসে ছেলেকে স্মার্টফোন দেওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে আমি বলব, ওকে কিনে দিন। বরং শেখান, সেটা কীভাবে ব্যবহার করবে। কতখানি ব্যবহার করবে।

শকুন্তলা প্রিন্সিপাল স্যারের কথার সঙ্গে একমত হয়নি কিন্তু কিনে দিয়েছিল। এখন মাঝে মাঝে ভাবে কিনে তো দিয়েছিল, কিন্তু প্রিন্সিপাল স্যারের কথামতো ব্যবহারটা কি শেখাতে পেরেছিল?

অমিত্রসূদন অধৈর্যের গলায় বলল, 'ওকে একটা ফোন করো, জিগ্যেস করো কখন আসবে?'

'ফোন করব? কিছুতেই আমার ফোন ধরতে চায় না। তুমি করো, তোমার ফোন ধরবে।'

'না, আমি করব না।' অমিত্রসূদন ক্ষুব্ধ গলায় বলল।

অমিত্রসূদন কেন এত ক্ষুব্ধ শকুন্তলা বুঝল না। সামান্য কারণে ইদানীং লোকটা এত রেগে যায়, খিট খিট করে, তার বিরক্তি লাগে।

'ঠিক আছে তোমার ফোন দাও। তোমার ফোন থেকে করি। ভাববে তুমি করছ।'

ফোনটা দিতে হল না, সামনের টেবিলেই রাখা ছিল। শকুন্তলা ফোন করল। ধরেছে। শকুন্তলা জানত, তার নম্বর দেখলে আর্য কিছুতেই রিসিভ করত না। ফোনে কথা বলল। 'ও চলে এসেছে। ক্লাবের কাছে।'

অমিত্রসূদন বাথরুমে উঠে গেল। চোখে মুখে জল দিয়ে এল। না, ও এলেই কিছু বলবে না। রাতের খাওয়া হোক, তারপর বলবে। ওরা তো বলেই গেল, টেনশন করবেন না। ওকে বকবেন না। ওর সঙ্গে যা কথা বলার আমরা বলব। অমিত্রসূদন তাহলে বাবা হয়ে কী করবে? বাথরুমের ভেতর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার নিজেকে বড় অসহায় লাগে। সে ঠিক কী কী করতে পারে? কোন পথে চললে, সেই পথ ঠিক হবে?

অমিত্রসূদন কাঁপছিল, কাঁদছিল। কলের জলে আবার ধুয়েও ফেলছিল দ্রুত। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল আর্য ঘরে ফিরেছে। শকুন্তলা বার দুয়েক অমিত্রসূদনকে বলল, 'আর্যর খোঁজ করছিলে, কই কিছু বললে না তো?' অমিত্রসূদন মুখ বুজিয়ে সরে থাকল।

শকুন্তলার মনে হল অমিত্রসূদন যেন কিছু ভাবছে। চিন্তায় আছে। এত ছেলে ছেলে করছিল, এখন দেখো ঘোরে ডুবে গেছে। একটা নাটকপাগল লোক, কখন যে কিসে ডুবে থাকে শকুন্তলা টের পায় না। তবে অভ্যেস হয়ে গেছে। এরা এমন হয়। নাটক ছাড়া আর কিছু বোঝে না। বোধহয় পারেও না।

রাতের খাওয়া দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে শেষ। অমিত্রসূদন বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শকুন্তলা বলল, 'এখনই বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়লে? বাব্বা ষাঁড়টা যে তোমাদের কোন নেশা ধরালো কে জানে?'

ম্লান হাসল অমিত্রসূদন বলল, 'ষাঁড়টা নেশা ধরায়নি, কিন্তু নেশার জিনিসের খোঁজে এ-বাড়িতে লোক এসেছিল।'

'নেশার জিনিস, মানে?' শকুন্তলা কিছুটা ঠিকরে উঠল। শকুন্তলার মনে হল, অমিত্রসূদন তাকে কথাটা বলেনি, হয়তো পার্ট মুখস্ত করছে। এমন তো কতই হয়েছে। সে ওর কথা শুনে উত্তর দিয়েছে, পরক্ষণেই বুঝেছে পাশের মানুষটা ডায়লগ মুখস্ত করছে।

'নারকোটিক্স সেল। লালবাজার।' অমিত্রসূদন খুব কেটে কেটে কথাগুলো বলল।

'আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না!' শকুন্তলা চাপা গলায় বলল।

'আমিও পারছি না শকুন্তলা। লালবাজার নারকোটিক্স সেল—পুলিশের লোক এসেছিল।'

'পুলিশ... কেন?' শকুন্তলা আঁতকে উঠল।

'ওরা আর্যর খোঁজ করছিল।'

'কী করেছে ও?'

'আমি জানি না। আমাকে কিছু বলেনি। কাল লালবাজার যেতে হবে। বারোটার সময়। কোনও ড্রাগস...'

শকুন্তলা বাকরহিত! কোনওক্রমে বলল, 'ড্রাগস? ওই হেরোইন, ব্রাউন সুগার ওই সব...?'

'জানি না। ওরা কিছুই বলেনি।'

শকুন্তলা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে। বলল, 'যারা ওইসব খায় তাদের তো অন্যরকম দেখতে হয়ে যায়। কেমন কাঠি, কাঠি! চোখ মুখ ভাঙা! না, না, ওরা ভুল

করছে। আমি ওদের রাস্তাঘাটে অনেক দেখেছি। দেখলেই বোঝা যায়।'

'আমি জানি না!'

'আর্যকে?'

'এবার বলব...'

'আমি ডাকছি।'

কিন্তু কেউই ডাকল না, বরং ওরা দুজনেই এসে দাঁড়াল আর্যর ঘরের সামনে। অমিত্রসূদন ডাকার আগেই শকুন্তলা আলত ধাক্কা দিতেই লকবিহীন দরজা খুলে গেল।

দরজার ওপারে বাবা-মাকে একসঙ্গে দেখেই আর্য বুঝল নিশ্চয়ই কোনও কেস খেয়েছে। সে এক লহমায় আন্দাজ করার চেষ্টা করল— চুল, না দিনে ঘুম—কোনটা নিয়ে এরা জ্ঞান দেবে আপাতত? বিরক্তি মুখে আর্য তাকাল মায়ের দিকে, 'কী হয়েছে?'

'কী করছিস?'

'সত্যি বলব, না মিথ্যে?'

'পাবজি খেলছিস?'

'খেলবে আমার সঙ্গে?'

অমিত্রসূদন আর্যর সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর মুখস্ত করা কথার মতো পর পর সবটুকু বলে যেতে লাগল। আজ সন্ধে থেকে ঠিক যা যা হয়েছে। আর্যর চোখে মুখে বিস্ময়, আবার মৃদু হাসিও। সে যেমন আধশোয়া হয়েছিল তেমনই আছে। চমকে উঠে বসেনি। হঠাৎ বলল, 'ওরা যখন আমার ঘর দেখছিল তুমি সামনে ছিলে?'

'হ্যাঁ আমার সামনেই ওরা দেখল। ওরা বলেছিল, ওদের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট নেই।'

তীক্ষ্ন গলায় আর্য বলল, 'তাহলে তুমি ওদের দেখতে দিলে কেন?'

'ওরা বলেছিল, ওরা আমাদের ভালো চায়।'

'তুমি ওদের বিশ্বাস করলে?'

'হ্যাঁ। আমি মনে করি, ওরা অবিশ্বাসের কাজ করবে না।'

'ওদের বিশ্বাস করা যায়, শুধু আমাকে করা যায় না! নো প্রবলেম, ঠিক আছে, চাপ নেই কিছু। ওরা কিছু পেল?'

'না। কিছু পায়নি।'

'তবে?'

'বললাম তো—ওরা এসেছিল, খবরটা দিতে।'

'বাবি ওরা খবরটা ফোনেও দিতে পারত। আমাদের ডেকে নিত পারত। ওরা আসলে আমার ঘর দেখতে চেয়েছিল। ভেরি গুড। টেনশনের কিছু নেই। দেখে নিয়েছে।'

'টেনশনের কিছু নেই!'

'না নেই। আমি গেস করেছিলাম, এরকম কিছু একটা হতে পারে। আমার দু-একজন চেনা ছেলে কদিনের মধ্যে ধরা পড়েছে। শুনলাম, ওদের সঙ্গে যাদের গোলমাল আছে

তাদের নাম বলেছে। সিম্পলি আমাকে কেস খাওয়াচ্ছে—নারকোটিক্স তাই এসেছিল। কোনও চাপ নেই। চলো কাল যাব।'

শকুন্তলা ঠিকরে উঠল, 'তুই সত্যি কথা বল—তুই কী করেছিস? ড্রাগ খেয়েছিস!'

'ওহ, তুমি একটু চুপ করবে! কাল বারোটা? বাবি আমরা তাহলে এগারোটাতেই বেরিয়ে পড়ব। তুমি টেনশন কোরো না। ওরাই আমার নাম বলেছে হয়তো, ফালতু একটু আমাকে পিন করবে।'

'কাল সকালে উঠে আগে তুই চুল কেটে আসবি!' শকুন্তলা গর্জে উঠল।

'যা-বাব্বা! চুল কাটব কেন?'

'ওই বড় বড় চুলগুলোর জন্য তোকে আরও সন্দেহ করবে। ভাববে গাঁজারু! গাঁজা খাস।'

'কী সন্দেহ করবে? চুল বড় থাকলেই সে গাঁজারু। গাঁজা খায়। ঠিক আছে, আমি চুল ছোট করে আসব। ছোট নয়, বরং কাল আমি নেড়া হয়ে আসব। ওরা ভাববে, ছেলেটা নেড়া যখন নির্ঘাত ক্যানসারের পেশেন্ট। কেমো নিচ্ছে।'

'কী বলছিস তুই?'

'হ্যাঁ বলছি। ওই যে তুমি গুন গুন করো রূপে তোমায় ভোলাব না... কিন্তু সত্যি নয় বুঝেছ। আমাকে এখন রূপেই ভোলাতে হবে। চুল বড় থাকলে গাঁজারু। ন্যাড়া হলে কেমো নিচ্ছে। কী শান্তি!'

কথাটা বলেই আর্য ঘরে ঢুকে শান্ত হাতে দরজা বন্ধ করে দিল।

অমিত্রসূদন ছেলের কথার মারপ্যাঁচগুলো শুনল। অন্য সময় হলে, শকুন্তলা নির্ঘাত বলত, বাপের মতো নাটকের ডায়লগ বলছিস, কিন্তু এখন সে থম মেরে গেল। ও ক্যানসারের কথা বলল! শকুন্তলার হাত-পা ছাড়িয়ে গলা তুলে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পারল না। শুধু বুকের ভেতর থেকে, গলার পথ ধরে কতগুলো অচেনা শব্দ বেরিয়ে এল। অবশ্য সে শব্দ কেউ শুনতে পেল না। কেননা ততক্ষণে রাস্তা মোড় থেকে তীব্র গতিতে ফোঁত ফোঁত শব্দ করতে করতে দারাসিং আসছে।

ওদিকে আশালতা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে শিবনাথবাবু তাকিয়ে আছে অমিত্রসূদনের দিকে।

পুলিশের গাড়ি দেখে খোঁজ নিয়েছেন, ওরা শিবনাথবাবুর কথাই বলল। অমিত্রসূদন নাটকের ডায়লগের মতো বিড়বিড় করল, ওরা পাসপোর্টের ভেরিফিকেশনে এসেছিল। ওরা পাসপোর্টের ভেরিফিকেশনে এসেছিল। ওরা পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে।...

এত কঠিন ডায়লগ অমিত্রসূদন যেন বলতেই পারছে না। গলার ভেতর আটকে যাচ্ছে।

পাঁচ

ষাঁড়টা তিনদিকের তিনটি ফ্ল্যাটবাড়ির মাঝে এসে দাঁড়াল। তারপর কয়েকমুহূর্ত সে পাথরের মূর্তি হয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকল। হয়তো তিন রাস্তার মোড়ে সে এমন অনেক স্ট্যাচু দেখেছে। হয়তো এমনই তিন রাস্তার মোড়ে সে নিজের একটা স্ট্যাচু প্রতিষ্ঠা

করার কথা ভাবছিল। ভাবছিল, কেমন হবে তার স্ট্যাচুর রং—সাদা, না কালো? মূর্তিটি কেমন হবে শান্ত, নাকি শিং বাগিয়ে তেড়ে যাওয়া দুর্ধর্ষ, দুরন্ত! উত্তরপ্রদেশের মায়াবতী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নিজের মূর্তি বানিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে সে কেন পারবে না? ষাঁড় বলে?

এইরকম তিন রাস্তার মোড়ে উত্তম দাস রাতেভিতে এসে দাঁড়ায়। কিছুটা শিং বাগানো ষাঁড়ের ভঙ্গিতে। দাঁড়িয়ে কয়েকজনকে ধমকায়। ষাঁড়ের মতো গোঁ গোঁ করে, ফোঁত ফোঁত করে।

উত্তম দাসের বাইকটা রাস্তার ধারে লাইট পোস্টের পাশে কাত করে দাঁড় করানো। বাইকটা সদ্য কিনেছে। রয়্যাল এনফিল্ড বুলেট। দারুণ দর্শনধারী, ভীষণ গম্ভীর গর্জন। গর্জনের কথাটা অবশ্য বয়স্করা বলেন। কিন্তু অল্প বয়েসিদের কাছে এমন একটা বাইক স্বপ্ন। দুরন্ত মডেল। উত্তমদার পছন্দ আছে।

অথচ এই উত্তম কয়েক বছর আগে এ-বাড়ি ও-বাড়িতে কেমন ফ্যা ফ্যা করে পার্টির খবরের কাগজ গছাত। সকালবেলা ওকে দেখলেই সবাই ভাবত ও খবরের কাগজ গছাবে। সন্ধেবেলা হলে চাঁদার বিল। সকাল সন্ধে লোকে ওকে দেখলেই অন্যদিকে পালাত। তবে হ্যাঁ, তখন ওর আলাদা একটা আলো ছিল। ওর নিজের মধ্যে বেশ একটা আত্মসম্মানবোধ ছিল। এখন এনফিল্ড বুলেট থাকে গেটের ওপারে। আর রাস্তার ওপর চার চাকা। ক'বছরে ওদের পুরোনো দোতলা বাড়িটা ঝাঁ চকচকে হয়ে গেছে। সেই উত্তম আর নেই, এখন সে উত্তম দাস—উত্তম দাস কলার উলটে হাঁক ডাক করা। তবু রাতে মদ খেয়ে এসে ও যেন নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে যায়। ভেতর থেকে কেউ যেন ওকে গুঁতো মারে। গুঁতোটা বেশ জোরালো। যাকে বলে ষাঁড়ের গুঁতো! ধাক্কা খেয়ে অন্য মানুষজন পড়ে যায়, কিন্তু উত্তম ঠিকরে ওঠে—দুরন্ত ষাঁড়ের চোখের সামনে লাল কাপড় ঝোলাবে বলে।

ইদানীং উত্তমের প্রতিদিন রাতে এই বউকে মারধর করে। একটু কান পাতলেই বোঝা যাবে, এই মারধরের কারণ তার স্ত্রী গোপা বা মেয়ে নয়। শত্রু, অদৃশ্য শত্রু। কিন্তু তারা উত্তম দাসের ধারেকাছেই আছে। তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সুযোগের অপেক্ষায়। যে-কোনওদিন তাকে ফেলে দেবে। কিন্তু মরার আগে উত্তম মরবে না। আর মরলেও সে মেরে মরবে। তার এসব কথার কোনও প্রতিবাদ করলেই গোপা চড় থাপ্পড় খায়। মাকে মারছে দেখে আদৃতা এলে সে-ও চড় থাবড়া খায়। কোনও কোনওদিন উত্তম হাত চালিয়ে নিজেই টাল রাখতে পারে না। হুড়মুড় করে পড়ে যায়। তারপর আরও জোরে চিৎকার করে—আমাকে গুঁতলি? গুঁতিয়ে ফেলে দিলি? তোরা মা মেয়ে মিলে, আমাকে স্কিম করছিস? আমাকে শিং দেখাচ্ছিস? তোদের শিং আমি ভেঙে দেব...।

ক'দিন আগে রাতেরবেলায় উত্তমকে পিছনে বসিয়ে নিয়ে আসছিল দুধকুমার। নতুন বাইক, তার ওপর বড্ড ভারী। মাল খেলে উত্তম রিসক নেয় না। দুধকুমারই ওকে পৌঁছে দেয়। সেদিনও আসছিল। আসতে আসতে দুধকুমার দেখল দারাসিংকে। আর তখন দুধকুমারের মনে একটু খচড়ামি এল, সে বাইকের হেড লাইটটা সরাসরি ফেলল দারাসিং-এর চোখে। একে বলে চুলকে ঘা! চোখে আলো পড়তেই দারাসিং একটু সরে গেল। আর তারপরই প্রবল বেগে এগিয়ে এল বাইকের দিকে।

দুধকুমার খুব আস্তেই বাইক চালাচ্ছিল। উত্তমদার নতুন বাইক, ভরসা করে তার হাতে দিয়েছে, আর পিছনে স্বয়ং উত্তমদা বসে। কিন্তু দারাসিংয়ের অমন রুদ্রমূর্তি দেখে দুধকুমার ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারল না সে কী করবে? স্পিড তুলে কেটে বেরিয়ে যাবে, না সামনের গলিতে ঢুকে যাবে—সে তীব্র শব্দে হর্ন বাজাল। এবং চকিত গতিতে দারাসিংকে কাটিয়ে নিয়ে রাস্তা ছেড়ে সামনে দিকের একটা বাড়ির গেটে গিয়ে দড়াম করে ধাক্কা মেরে উলটে গেল। ধাক্কা মারার আগের মুহূর্তে রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েছিল উত্তম। সে উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্ট আর হাত ঝেড়ে দেখল বাইক চাপা পড়ে দুধকুমার কাতরাচ্ছে। তখন নেশা সবার ছুটে গেছে। দুধকুমারকে তোলা হল। দুধকুমারের পায়ের হাড় দু-টুকরো।

সেই থেকে ষাঁড়টার ওপর উত্তমের খুব রাগ! ওই রাতেই ওর মাথায় একটা দানা ঢুকিয়ে দেওয়ার ফরমান জারি করা যেত। কিন্তু এখন বন্য প্রাণী হত্যা মারাত্মক অপরাধ।

কেউ কেউ উত্তমকে বলেছিল, ‘ষাঁড়টা বন্য নয় দাদা!’

উত্তম চটজলদি সংশোধন করে নিয়েছিল, ‘আরে বনে থাকলেই কি বন্য? ওর স্বভাবটাই বন্য। আর হিংস্র! ওকে খতম করে দেওয়া উচিত।’

কিন্তু খতম করবে কে? আর কীভাবেই বা করবে? দারাসিং বেড়ালবাচ্চা নয়, যে বস্তা করে অন্য জায়গায় ফেলে আসবে।

একজন বুদ্ধি দিল, ‘দাদা তুমি বরং দেবার্চনদাকে বলো। দেবার্চনদা করপোরেশনে বলে দিলে করপোরেশনের লোক এসে তুলে নিয়ে যাবে।’

কথাটা উত্তমের বড় গায়ে লাগল। বলল, ‘করপোরেশনকে আমিও বলে দিতে পারি। কিন্তু ওরা তুলতে চাইছে না। এটা নাকি ধর্মের ষাঁড়!’

‘ধর্মের ষাঁড়!’

‘ইয়েস! কেউ শ্রাদ্ধের সময় বৃষোৎসর্গ করেছিল। এই ষাঁড়ের লেজ ধরে এপার থেকে ওপার গিয়েছিল। বৈতরণী পার করেছিল। এ ষাঁড় বৃষোৎসর্গের!’

উত্তম এখন দোতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে। রাস্তার ওপর তার চার চাকাটা থাকে। ধর্মের ষাঁড়টা এসে একদিন ঢুঁসো মেরে পিছনটা তুবড়ে দিয়ে গিয়েছিল। গ্যারাজে পাঠিয়ে সেটা ঠিক করতে হয়েছে। আবার যদি করে—

কিন্তু উত্তমের হঠাৎ মনে হল, ষাঁড় নয়। দুটো বাইক। কতগুলো অচেনা ছেলে। ছেলেগুলো ঠিক সুবিধের নয়। ক’জন হবে...তিনচারজন। তার বাড়ির দিকে তাকিয়ে।

ওরা কারা? কাদের ছেলে? কারা পাঠালো? কী মতলব ওদের? কেন উত্তমের দোতলার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে? কোনও স্কিম করছে কি? ওদের টার্গেট কি উত্তম?

সে একটু আড়ালে গেল। দু'চোখ ঘোলা। সে প্রচণ্ড সতর্ক হল। না, দোতলার বারান্দাটা গ্রিল দিয়ে ঘিরতে হবে। দিনকাল ভালো নয়। তার উত্থান অনেকেই সহ্য করতে পারছে না। সে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। ওরা সহ্য করবে কী করে? উত্তম ঘরে ঢুকল। তার গোপন জায়গা থেকে রিভলভার বের করে নিয়ে এল।

সাবধানের মার নেই!

ছয়

সারারাত ঘুম হল না অমিত্রসূদনের। বার বার মনে হল শকুন্তলা ঘুমায়নি। জেগে। কিন্তু মড়ার মতো পড়ে আছে। অমিত্রসূদনও মড়ার মতো পড়ে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু মড়া তো নয়, মড়ার মতো। তাতে বুকের ভেতর উথালপাথাল বেশি হচ্ছে। ওরা বাড়িতে এল—নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর অপরাধ। নাহলে ওরা এত এত খোঁজ রাখে? কে কোথায় যাচ্ছে, কে কখন বাড়ি ফিরছে? এত কিছু কি অহেতুক! মিথ্যে সন্দেহ! নাকি আর্যনীল তাদের ঠকাচ্ছে? জটিল কোনও ধাঁধার ভেতর ঢুকে তাকে দিকভ্রষ্ট করে ঘোরাচ্ছে? কে তাকে সঠিক দিশা দেবে?

খুব ভোরবেলায় আজ এ-বাড়ির সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। একটু নজর করে দেখলেই বিষয়টা একটু বেমানানই লাগবে। এ-বাড়িতে ভোরে ওঠে একমাত্র শকুন্তলা। সাতটা নাগাদ ওঠে অমিত্রসূদন। আর বেশ দেরিতে আর্যনীল ওঠে। অনেকদিনই কলেজের ফার্স্ট ক্লাসটা ও মিস করে। এনিয়ে শকুন্তলা বিস্তর চিৎকার চেঁচামেচি করে। কিন্তু করে কোনও লাভ হয় না। আর্যনীল বলে, সারারাত ও পড়েছে। কিন্তু শকুন্তলা মনে করে, সারারাত ও বিদেশে চলে যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করেছে। পাবজি খেলেছে। নেট! নেট! ইন্টারনেটই হচ্ছে যত পাপ!

শকুন্তলা চেয়েছিল রাত বারোটার পরে ওয়াইফাই বন্ধ করে দেবে। অমিত্রসূদন রাজি হয়নি।

অমিত্রসূদন জানে, বিদেশে-পড়া নিয়ে এ বাড়িতে একটা গোপন হতাশা আছে। আর্যনীলের খুব ঘনিষ্ঠ চার-পাঁচজন বন্ধুই বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করছে। আর্যনীলেরও ছিল, ইউরোপের কোনও দেশে গিয়ে পড়াশোনা করবে। কিন্তু অমিত্রসূদনের সেই ক্ষমতা নেই।

আজ কিন্তু ছটা না বাজতে বাজতে আর্যনীলকে দেখা গেল। কোনও ডাকাডাকি নেই। চিৎকার নেই। এত সকালে আজ এ বাড়ির সবাইকে দেখা যাচ্ছে অলসভাবে যে যার মতো ঘুরছে, ফিরছে। ভোরবেলায় শকুন্তলা খুব আস্তে গান চালায়। রবীন্দ্রসংগীত। আজ আর গান বাজছে না। সাতটা নাগাদ অমিত্রসূদনকে দেখা যায় ছাদে, ব্যায়াম করছে। কখনও নাচের ভঙ্গিতে, অনেক রকমভাবেই শরীরকে ভেঙেচুরে রাখছে। হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে উঠছে। পাখি ডাকার মতো, হনুমান তাড়ানোর মতো। হাঁ করে কথা বলছে। সব কিছুই নাটকের জন্য। নাটকে তো শুধু কথা কান্না আর হাসি থাকে না, গোটা একটা জীবন থাকে। প্রকৃতি থাকে।

একটু বেলায় আর্যনীল এসে টাকা চাইল। সে চুল কাটতে যাবে। শকুন্তলা টাকা দিল। ৫০ টাকা। অনেকদিন পরে আজ আর্যনীল তার মায়ের মনের মতো করে চুল কেটে এল।

বাড়ির গাড়ি। সেন্টার থেকে ড্রাইভার ভাড়া করা। ঘণ্টা মাপা টাকা। গাড়িতে ওঠার সময় খুব সতর্ক গলায় অমিত্রসূদন তার ছেলেকে বলল গাড়িতে কোনও কথা বলবি না।

আর্যনীল বলল, 'মানে?'

'মানে, আমরা কোথায় যাচ্ছি? কেন যাচ্ছি? কোনও ডিসকাশন করার দরকার নেই।'

'কোথায় যাচ্ছি না জানলে ড্রাইভার যাবে কী করে?'

'নারকোটিক্স সেল লালবাজারে নয়। বাইরে পোদ্দার কোর্টের পাশে ইমপ্রূভমেন্ট ট্রাস্ট বিল্ডিং-এ।'

'তাহলে যে কাল বললে লালবাজারে যেতে বলেছে।'

'লালবাজারে স্পেস প্রবলেম, তাই অফিসটা ওখানে। আমাদের ওখানেই যেতে হবে।'

আর্যনীল একটু চুপ করে থাকল। হঠাৎ বলল, 'ব্যাপারটার মধ্যে এত গোপনীয়তার কী আছে?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

'ওদের কাছে আমার নাম আছে। ওরা মিথ্যে বলেছে আমার সঙ্গে ওরা কথা বলবে। তারপর ঝামেলা মিটে যাবে।'

'সেটা হলেই ভালো।'

'তুমি কিন্তু খুব টেনশন করছ।'

গাড়ির ড্রাইভার এল। অমিত্রসূদন গাড়ির সামনে গিয়ে বসল। অন্যসময় সে পিছনেই বসে। আর্যনীল সবসময়ই সামনে থাকে। কিন্তু আজ সে যেন এক অদৃশ্য যুদ্ধে চলেছে এক্ষেত্রে তাকে সামনেই থাকতে হবে। আর্যনীলের সামনে, তার পরিবারের সামনে, তাবৎ বিশ্ব সংসারের মুখোমুখি সে।

কে.আই.টি বিল্ডিং। সিক্সথ ফ্লোর। লিফট শেষে লম্বা করিডর। ডাইনে বাঁয়ে এক একটা ঘর এক একটা আলাদা জগৎ। স্ন্যাচিং। সাইবার ক্রাইম। ল' সেল। একেবারে শেষ মাথায় নারকোটিক্স। দরজার বাইরে অ্যান্টি ড্রাগ পোস্টার। কালো পোস্টারে সাদা করোটি। নিশ্চিত মৃত্যুর ঠিকানা আঁকা। জানা গেল বড়বাবু আসেননি এখনও।

টানা লম্বা বেঞ্চে অমিত্রসূদন বসে, মাথায় ভারী পাথর চাপানো। আর্যনীল কিন্তু স্বাভাবিক, এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মারছে। কাল রাতের মতো অমিত্রসূদন আজ অস্থির নয়, বরং স্থির।

আর্যনীল মোবাইলে। বাইরের বেঞ্চে আরও তিনটি ছেলে বিমর্ষভাবে বসে। আর্য ওদের দিকে একঝলক তাকিয়ে মোবাইলেই মন দিল। অমিত্রসূদন ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু শুধু তাকিয়েইছিল, সে যেমন করে দেখে তেমন করে দেখতে পাচ্ছিল না।

একটু পরেই বড়বাবু এলেন। লম্বা, পেটানো টানটান চেহারা। পিছনে আরও দুজন, দ্রুত হাঁটছে তাল মিলিয়ে। তার মধ্যে একজন কাল গিয়েছিল অমিত্রসূদনের বাড়ি। দেবেশ ঘোষের সঙ্গে। ওরা সামনের ঘরে ঢুকে গেল। তারও একটু পরে ডাক এল।

ঘরে ঢুকতেই মানুষটা অমিত্রসূদনের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করল। বসুন।

অমিত্রসূদন ও আর্যনীল পাশাপাশি বসল।

আপনার নাটক আমি দেখেছি। আমার নাম বিশ্বদীপ ব্যানার্জি। আমি একসময় একটা গ্রুপ থিয়েটারে ছিলাম। চাকরি পাওয়ার পরও বেশ কিছুদিন চালিয়েছিলাম। তারপর আর পারিনি।

উনিই নারকোটিক্স সেলের প্রধান। ওঁর ওপরে ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ।

অমিত্রসূদন চেয়ার টেনে একটু টেবিলের দিকে এগিয়ে বসল।

আর্যনীলের দিকে তাকিয়ে বিশ্বদীপ ব্যানার্জি বলল, 'তুমি আর্যনীল। যাও বাইরে গিয়ে বসো। আমি তোমার বাবার সঙ্গে একটু কথা বলে নিই, তারপর তোমায় ডেকে নেব।'

আর্যনীল চলে যেতেই বিশ্বদীপ চেয়ারে এলিয়ে বসল। বলল, 'আপনাদের কেন ডেকেছি নিশ্চয়ই যে অফিসার গিয়েছিলেন তিনি আপনাদের বলেছেন।'

অমিত্রসূদন ঘাড় নাড়ল।

'বিষয়টা তাহলে জানেন, আমি নতুন করে কিছু বলছি না।'

'তবু বলুন—ঠিক কেন আমাদের ডেকেছেন?'

'আমাদের ডায়েরিতে আপনার ছেলের নাম আছে। এই ডায়েরিতে তাদেরই নাম থাকে যারা কোনও না কোনওভাবে ড্রাগস চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকে।'

বিশ্বদীপের কথায় অমিত্রসূদন কেঁপে উঠল। বলল, 'ও কি কোনও...' কথাটা সে শেষ করতে পারল না।

'ড্রাগস র‍্যাকেটের সঙ্গে ওর যোগাযোগের তেমন কোনও প্রমাণ আমরা পাইনি। আবার ঠিক সেভাবে বলতে পারছি না, আপনার ছেলে নির্দোষ। কেননা, আমাদের বেশ কয়েকজন ছেলের কাছ থেকে আমরা আর্যনীলের নাম শুনেছি। এবার আপনি বলুন—'

মাথা নাড়ল অমিত্রসূদন। 'আমার কিছু বলার নেই।'

'ছেলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?' খুব সোজাসুজি এবং সহজভাবে প্রশ্ন করল বিশ্বদীপ।

'আপনারা তো সব খোঁজ খবরই রেখেছেন।'

'সে তো বাইরের খবর। ভেতরেরটা আপনি বলবেন? কার সঙ্গে বেশি বন্ধুত্ব? আপনার, না মিসেসের সঙ্গে?'

'আমি সময় পাই কখন? অফিস, নাটক, লেখালিখি...।'

'ঠিক, ঠিক। বেশ কিছুদিন আগে, আপনার একটা ইন্টারভিউ পড়ছিলাম—অফিস ফাঁকি দিয়ে আমি নাটক করি না। প্রয়োজনে ছুটি নিই। হ্যাঁ, তাতে অনেক সময় আমি মাইনের পুরো টাকা ঘরে নিয়ে যেতে পারি না। কিন্তু অনৈতিকভাবে জোগাড় করা সময় আমি নাটককে দিই না...।'

'হ্যাঁ একটা পত্রিকা আমার একটা ইন্টারভিউ ছেপেছিল।'

'এবার আপনার বিশ্বাস হল তো, আমি পুলিশ সার্ভিসে থাকতে পারি, কিন্তু নাটক আমার গোপন প্রেম। সময় পেলেই দেখি, নাটক দেখি, নাটক সংক্রান্ত লেখা পড়ি।' বিশ্বদীপ থামল, বলল, 'ওর মায়ের সঙ্গেই ভাব বেশি, কিন্তু বন্ধুত্ব কি আছে?'

'আগে খুব ভাব ছিল, এখন সম্পর্কটা একটু ফিকে! টানাপোড়েন বেশি'—

‘সে তো হবেই। বড় হয়েছে। চা খাবেন?’ বিশ্বদীপ জিগ্যেস করে উত্তরের অপেক্ষা করল না। বলল, ‘এই এখানে আমাদের চা দাও।’

চা এল। বিশ্বদীপ বলল, ‘বাইরের ছেলেপুলেগুলোকেও দিস।’

বিশ্বদীপ বলল, ‘আর ভাব? সে তো মা বাবার সঙ্গে থাকবেই। কিন্তু আপনাদের কার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে? বন্ধুর মতো মন খুলে কথা বলতে পারে?’

অমিত্রসূদন চুপ করে থাকল। তার সঙ্গে নেই। শকুন্তলার সঙ্গেও নেই। মাঝে মাঝে অবশ্য শকুন্তলার কাছ থেকে আর্যনীল সম্পর্কে টুকটাক ইনফরমেশন পায়। কিছু কথা জানতে পারে। কিন্তু দু-দিন ছাড়া ছাড়াই শকুন্তলার সঙ্গে ওর মুখ দেখাদেখি থাকে না। বন্ধুত্ব বা বৈরিতা রাতের খাবার সময়ই খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

বিশ্বদীপ বলল, ‘ছেলে কী ধরনের, বা কী কী ধরনের নেশা করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?’

অমিত্রসূদন কাঠ হয়ে বিশ্বদীপের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিশ্বদীপ তার চায়ের কাপে লম্বা করে শেষ চুমুক দেয়। ‘বলুন, গোপন করলে আপনারা ঠকবেন... আমরা সাহায্য করতে চাই।’

অমিত্রসূদন রুমাল বের করে ঘাম মোছে। ‘আমি তেমন বাড়ি থাকি না। সকালে দশটা নাগাদ বেরিয়ে যাই, ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় দশটা হয়ে যায়—হয় সেমিনার, নয় নাটক। বাড়ি ফিরেও লেখা, পড়া।’

‘মোটকথা আপনি নিজের জগতে থাকেন। আর আপনার বারো মাসে আঠেরো পার্বণ! সে তো আমরা জানি। কিন্তু যতক্ষণ বাড়ি থাকেন, রাত দশটা থেকে সকাল দশটা আপনি ততক্ষণের কথা বলুন। ওটাই আসল টাইম।’

‘কী বলব বলুন?’

‘আপনার ছেলে নেশা করে কিনা, কখনও কোনও আঁচ পেয়েছেন?’

‘ওর মা ক’দিন আগে বলছিল, দু, তিনদিন ওর পকেটে দেশলাই পেয়েছে। হয়তো সিগারেট খাচ্ছে।’

‘সিগারেট পেয়েছেন?’

‘ওর মা বলতে পারবে। ওর মাকে ফোন করব? আপনি ফোনে কথা বলবেন?’

‘এক্ষুনি দরকার নেই। সিগারেট হতে পারে, গাঁজাও হতে পারে। বা আরও ভারী কোনও নেশা?’

‘বলতে পারব না। তবে গাঁজা খেলে গন্ধ পেতাম। তেমন কোনওদিন মনে হয়নি। আর অন্যকিছু হলে চেহারায় কি ছাপ থাকত না!’

‘বাঃ এটা ভালো বলেছেন। আচ্ছা, ওর ঘুম নিয়ে সন্দেহ হয়েছে কখনও?’

‘মানে?’

‘মানে, সবাই যেমন ঘুমায়—স্বাভাবিক ঘুম। কখনও মনে হয়েছে আপনার ছেলের ঘুমটা স্বাভাবিক নয়, বড্ড বেশি ঘুমাচ্ছে?’

অমিত্রসূদন ফ্যাকাশে মুখে, একটু চিন্তা করল। বলল, ‘হ্যাঁ, অনেকদিন সকালের ক্লাস করতে পারে না। এই নিয়ে ওর মা চিৎকার করে। দেখুন, আমি রাত দেড়টা দুটো পর্যন্ত

প্রায় দিনই লেখাপড়ার কাজ করি। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি জানি ও জেগে আছে। ওর ঘরে আলো জ্বলছে। কখনও কখনও ফ্রিজ খুলছে, এটা সেটা খাচ্ছে।'

'সারারাত জেগে থাকলে দিনের বেলা ঘুমাবে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু আমি বলছি, একটু অন্যরকম কথা—, যেমন রাতে ঠিক সময়ে শুলো, কিন্তু উঠল পরের দিন দুপুরে বা বিকেলে। বা আট দশ ঘণ্টা পরও খুব গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন এমন কোনওদিন দেখেছেন?'

'না, দেখিনি। শুনিওনি।' অমিত্রসূদন সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল।

'আচ্ছা। নেশা করার টেনডেন্সি আছে। নেশা সংক্রান্ত কোনও কথা কোনও সময় আলোচনা হয়েছে? ওই ব্যাপারে জ্ঞান কেমন?'

'এইট থেকে বলত ওদের স্কুলের প্রচুর ছেলে সিগারেট খায়। স্কুলেই। দু-একজনের নাম বলত, তারা গাঁজা খেত। একবার বলেছিল, ওয়াটার বটলে করে কারা সব ভদকা মিশিয়ে স্কুলে আনে।'

'এসব পুরনো। দশ বিশ বছর আগে নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেও চালু ছিল। আর?'

'ওদের স্কুলের কিছু খ্রিস্টান ও মুসলিম ছেলে ডেনড্রাইট দিয়ে নেশা করে।'

'কেমন করে সেই নেশা করে জানেন?'

'ওর কাছেই শুনেছি, একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে নাকি আঠা ঢেলে ব্যাগটা ঘষে। তারপর ব্যাগের মুখে ওরা নাক মুখ চেপে শ্বাস নেয়।'

'মারাত্মক নেশা। খুব চলছে। আর—'

'বাইরে থেকে ফেরার পর ওর মা দু'দিন ওর গা থেকে মদের গন্ধ পেয়েছিল। সেই নিয়ে তুলকালাম হয়েছিল বাড়িতে। আমি পরে জেনেছি। শুনেছি, ওর মা নাকি মেরেওছিল। আমি বারণ করেছিলাম গায়ে না হাত তুলতে।'

'বেশ করেছে। গান্ধীজিও বলেছেন প্রয়োজনে সন্তানকেও চপেটাঘাত করতে হবে। আর?'

অমিত্রসূদন মাথা নাড়েন। 'না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না।'

বিশ্বদীপ ব্যানার্জি টেবিলের ওপর পেন ঠুকল। 'শুনুন, এতক্ষণ যা বললেন, এগুলো একজন স্টুডেন্টের করা উচিত নয়, ঠিক কথা। আমি আপনি সবাই বলব। এনিয়ে কোনও দ্বিধা নেই। কিন্তু মনে করে দেখুন, এই বয়েসটায় আমরা বা আমাদের বন্ধুরাও টুকটাক সুযোগ সুবিধেমতো এই নিষিদ্ধ নেশার জগতে ঢুকেছি। এখন দিনকাল পালটে গেছে। একবার ভেবে দেখুন, আমার আপনার ছেলেরা কোন স্কুলে পড়ছে? বাড়ির কাছাকাছি পাড়ার স্কুল হলে একটু হলেও খবরের মধ্যে আপনি থাকতেন। আপনার সংযোগ থাকত। আগেকার দিনে আমি যে এলাকায় থাকব, তাকে ঘিরে থাকা দু-তিনটে স্কুলের মধ্যে কোনও না কোনওটায় আমি পড়ব। সেখানে আমার যদি কোনও বিচ্যুতি ঘটে—ফেল করলাম, সিগারেট খেলাম, ক্লাস কাটলাম, কেউ না কেউ সে কথা বাইরে আলোচনা করবে। সেই আলোচনা হেঁটে হেঁটে বাড়ি চলে আসবে।

আর এখন বেশিভাগ ছাত্রছাত্রী ছড়ানো ছিটানো স্কুলে পড়ছে। কোনওটাই পাড়ার স্কুল নয়। সেই স্কুলগুলোর সঙ্গে আমাদের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। যা আছে তা ওদের সূত্রে, আর ওরা একটা মিক্সড কালচারে মানুষ হচ্ছে। আমরা তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দুচোখ

বন্ধ করতে চাইছি। অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না। বাইরে এখন প্রলয় চলছে। আর আমরা অন্ধ সেজে না দেখার ভান করছি।'

বিশ্বদীপের কথার মাঝেই অমিত্রসূদন বলল, 'আমি আর কিছু জানি না, জানলে বলে দিতাম। আমি এখনও বিশ্বাস করি, আমাদের ভালোর জন্য আপনারা ডেকেছেন।'

'এমন কি হতে পারে না, যা স্বাভাবিক তা নিয়ে আপনারা চিৎকার করেছেন, আর যা অস্বাভাবিক তাকে বুঝতেই পারেননি। কেননা সেটা আপনাদের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। একজনকে আমি জানি, যাদের ঘরে অনেক পোড়া দেশলাই কাঠি দেখেও বাবা মা সন্দেহ করেনি ছেলে হেরোইন আসক্ত। কারণ তারা ভেবেছে, ছেলে ঘরে ধূপ জ্বালায়। তেমন আপনাদের ক্ষেত্রেও হতে পারে, যেটা স্বাভাবিক ভাবছেন আসলে সেটাই অস্বাভাবিক!

'হতে পারে। এবার বলুন কোনটা আমি বুঝতে পারিনি। সেগুলো কেমন জিনিস—

'বলব, আপনার ছেলেকে ডেকে নিই। অমিত্রসূদনবাবু এরা সিঁদ কাটছে, ব্যক্তি জীবনে, সামাজিক জীবনে। আপনি কেমিক্যাল ড্রাগসের কথা শুনেছেন?'

'নাম শুনেছি কিন্তু তেমন কিছু জানি না।' ফ্যাসফেসে গলায় অমিত্রসূদন বলল।

'গাঁজা চরসের দিন এখন শেষ। কেমিক্যাল ড্রাগস বা সাইকোডেলিক ড্রাগস হল এই মুহূর্তে সভ্যতার কঠিন এক চ্যালেঞ্জ। এটা একটা সাংঘাতিক ড্রাগ। এটা নিলে আপনার মুড ইমোশন খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাবে। কেউ বলতে পারবে না এই ড্রাগস নিলে ঠিক কী ঘটবে? পুরোটাই আন-প্রেডিকটেবল। আর এই পরিবর্তনটা ভিন্ন স্তরের। ইমোশন এক স্তর থেকে ভিন্ন স্তরে ওঠানামা করবে। মারাত্মক এক হ্যালুসিনেশন।

সাইকোডেলিক ড্রাগের কাজটাই হল বিভ্রম সৃষ্টি করা। এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত লাইসার্জিক অ্যাসিড ডাইইথ্যালামাইড বা এলএসডি। একটা পাতলা কাগজে রেখে এটা নেওয়া যায়। চূড়ান্ত নেশা করার জন্য প্রয়োজন মাত্র ১৫ মাইক্রোগ্রাম। জাস্ট একটা বালির কণা। অন্যান্য শুকনো নেশায় এই আনন্দ পেতে কয়েকশো গ্রাম নিতে হবে। এদের মধ্যে সেরা হচ্ছে ডিএমটি ডাইমেথ্যালট্রিপটামেন।

আপনার প্রশ্ন হতে পারে কেমন এই নেশা? এক কথায় বলব, রঙিন ফোয়ারা। সাইকোডেলিক ড্রাগ আমাদের মস্তিষ্কের গভীরে থাকা পিনিয়াল গ্ল্যান্ডকে দারুণভাবে স্পর্শ করে। পিনিয়াল গ্ল্যান্ডকে আমরা 'তৃতীয় নয়ন' বলি। পিনিয়াল গ্ল্যান্ডই নাকি আমাদের স্বপ্ন দেখায়। যে কোনও সাইকোডেলিক ড্রাগের চেয়ে ডিএমটির আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতা অনেক অনেক বেশি। আসলে সাইকোডেলিক ড্রাগ আমাদের ব্রেনের সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে দেয়। কম্পিউটার গোলমাল করলে দেখেছেন, সেটা কীরকম আনপ্রেডিকটেবল ব্যবহার করে। ঠিক তেমন। কম্পিউটারের ভেতর যেন পাগলা হাওয়া বয়, তাণ্ডব হয়—সাইকোডেলিক ড্রাগও আমাদের মাথার ভেতর সব ঘেঁটে দেয়। খুব সামান্য পরিমাণ খেতে হয় শুধু। পরিমাণটা কত জানেন এলএসডি ডোজ সাধারণত মাইক্রোগ্রামে, মানে এক গ্রামের এক মিলিয়ন ভাগে মাপ করা হয়। আর খেতে হয় ৪০ থেকে ৫০০ মাইক্রোগ্রাম। সুগার কিউব বা হোমিওপ্যাথির গ্লোবিউলসে আপনি ভরে নিতে পারেন। তারপর একটা গুলি। দাঁড়ান আর্যকে আমি ডাকি।'

সুগার কিউব বা হোমিওপ্যাথির গ্লোবিউলস! অমিত্রসূদনের গলায় কেউ পা দিয়ে আছে। 'ও কি কেমিক্যাল ড্রাগ নিচ্ছে?' অমিত্রসূদন বিড়বিড় করে বলল।

‘জানি না, জানার জন্যই তো ডেকে পাঠিয়েছি।’

সাত

বিশ্বদীপের পাশে বসল আর্যনীল। ওর বাবার মুখোমুখি। বিশ্বদীপ চেয়ারটা কোনাকুনি করে ওর দিকে ঘুরে বসেছে। ‘আর্য, চা পাঠালাম, খেয়েছিস?’

আর্যনীল ঘাড় হেলাল। সেইসঙ্গে খুব ভালো করে ঘরটা দেখল। লম্বা টানা একটা হল ঘর। তারই একপাশে নারকোটিক সেল-এর বড়বাবু বিশ্বদীপ ব্যানার্জির বসার টেবিল। এই হল ঘরকে ঘিরে আরও অনেক ঘর। সার সার বন্ধ দরজা। এই টেবিল চেয়ারগুলো যেন ঠিক অফিসের ভেতর কথা বলার জায়গা। কেননা টেবিলে কোনও ফাইল বা লেখার সরঞ্জাম নেই। হয়তো ভেতরের দিকে অন্য কোনও ঘরে বড়বাবুর আলাদা চেম্বার আছে।

‘চা-টা ভালো?’

আর্যনীল হাসল, ‘ঠিক আছে।’

বিশ্বদীপ মাথা ঝাঁকিয়ে ঠোঁট টিপল, ‘তোদের জেনারেশনটা আমার এই ব্যাপারে খুব ভালো লাগে, অহেতুক ভালো বলিস না। খুব ভালো কিছু না হলে অহেতুক প্রশংসা করিস না। একদম ঠিক। সত্যি চা-টা মোটেই ভালো না।’

আর্যনীল বলল, ‘সরি আঙ্কেল, আমার যেমন লেগেছে, সেটাই বলেছি।’

‘ভেরি গুড, সেটাই বলবি। সাহস করে বল, আমি তোর সঙ্গে আছি।’

‘তাহলে বলো, তোমরা কাল আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে, কিছু কী পেয়েছ?’

‘না, পাইনি। ওরা জানত, পাবে না। আসলে তোর ঘরটা দেখতে চেয়েছিল।’

‘কী দেখলে?’

‘সেটা তোকে পরে বলব। তার আগে বলি, তোকে আমি ডেকেছিলাম, আমার কিছু প্রশ্ন আছে সেগুলো জানব বলে। এখন তুই আমাকে প্রশ্ন করছিস! এক্সেলেন্ট!’ বিশ্বদীপ তাকায় অমিত্রসূদনের দিকে। ‘এদের আমার এই জন্যে খুব ভালো লাগে বুঝলেন, ওরা প্রথমেই নিজের অবস্থানটা জেনে নিতে চায়।’

অমিত্রসূদন একটু আগে তাকিয়েছিল আর্যনীলের দিকে। দেখছিল, আর্য কত স্বাভাবিক। যেন কিচ্ছু হয়নি। অথচ অমিত্রসূদন জানে, আর্য আজ ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেছে—যা কোনওদিন ওঠে না। আজ কোনও কথা ছাড়াই চুল কাটতে চলে গেছে। আর যেভাবে চুল কেটেছে, যে স্টাইলে, তা গত দু-বছরে অমিত্রসূদন দেখেনি। তাহলে কি স্বাভাবিকতার আড়ালে আর্য নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চাইছে? অন্যভাবে স্বাভাবিককরণ করে নিয়ে নিজের আড়াল খুঁজছে? গোপন করার মুখোশ পরছে!

আর্যনীল বলল, ‘তাহলে সন্দেহ করছ কেন?’

বিশ্বদীপ বলল, ‘অনেকেই তোর নাম বলেছে...’

‘কারা বলেছে? সানি? না অভিনব জয়সওয়াল?’

‘হ্যাঁ, সানি বলেছে। অভিনবও বলেছে।’

‘অভিনব তো ছাড়া পেয়ে গেছে। ওর বাবার প্রচুর টাকা। ওকে জেলে আটকে রাখতে পারবে না।’

‘জেলে আটকে রাখাটা আমাদের কাজ না, ওটা আইন করবে, আইনের ফাঁক দিয়ে ও বেরিয়ে গেছে। কিন্তু যাবে কোথায়?’ বিশ্বদীপ হাসল। ‘হ্যাঁ, তার আগে বলি, সানি কিন্তু জেলে। কবে বেল পাবে তার ঠিক নেই। অভিনব বেল পেয়ে গেছে ঠিক। খুব বেশি কিছু ওর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। ওকে একটা চান্স দিলাম। শুধরালে ভালো। নাহলে যে কোনওদিন আবার তুলে নেব। ও আমাদের নজরে আছে। আর শোন একটা কথা বলি, কার বাপের পয়সা আছে আমরা দেখি না।—

অভিনব জয়সওয়ালকে ছাড়া হল। ছাড়া হল মানে, ওকে বাড়তে দেওয়া হল। ও দ্বিগুণ সাহস নিয়ে ফিরে গেল। আবার শুরু করল। ও ছোট মাছ। এবার যার মুখে ঢুকবে সে বড় মাছ হতে পারে। আমরা তখন বড় মাছ ধরব।’

‘আমি কেন তোমাদের নজরে বলো?’ আর্যনীল সোজা হয়ে বসল।

‘আমি বলি, তুই কেন থাকবি না—সেটা বল? শোন তোর নামে আমাদের কাছে বিস্তর অভিযোগ আছে। যাতে ইচ্ছে করলে আমরা তোকে যে কোনও সময় তুলে নিতে পারি।’

‘শুধু মাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে তুলে নিতে পারো? কোনও তো প্রুফ নেই?’

‘সলিড প্রুফ আছে। আমি ইচ্ছে করলে, তোর সঙ্গে একটাও কথা না বলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে লকআপ করে দিতে পারি। জেল তোর জন্য বাঁধা।’

বিশ্বদীপের কথায় অদ্ভুতভাবে থমকে গেল আর্যনীল। সারা ঘরের ভেতর বিশ্বদীপের কথাটা গমগম করে উঠল।

আর্য শান্ত গলায় বলল, ‘তুমি ঠিক বলছ আঙ্কেল? প্রুফ আছে! কী করেছি আমি?’

অমিত্রসূদনের বুকের ভেতর কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। সে যেন তোলপাড় করা রক্তের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। প্রমাণ আছে নারকোটিক্স সেল-এর অফিসার ইনচার্জের কাছে? প্রমাণ!

‘হ্যাঁ রে আছে। তাই জন্যে তোকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। তোকে ছেড়ে রেখেছিলাম। একেবারে প্রমাণসহ হাতেনাতে ধরব বলে। তাহলে তোকে আর এত প্রশ্ন করতে হতো না, সোজা কোর্টে চালান করে দিতাম। কিন্তু একটা খটকা থেকে তোকে ডেকে পাঠানো। ব্যাপার আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না।’

‘কী সেটা আমাকে বলো?’

‘বলব, তার আগে বল—গাঁজা খেয়েছিস?’

‘হ্যাঁ।’

‘নেশা আছে?’

‘না। বন্ধুদের সঙ্গে শখ করে খেয়েছি।’

‘বাড়িতে খেয়েছিস? একা?’

‘দু-তিনদিন।’

‘চরস?’

একটু থমকে ‘হ্যাঁ। একবার। জাস্ট।’

‘হেরোইন, ব্রাউন সুগার?’

‘আমার সামনে খেয়েছে—আমি ঠিক সাহস পাইনি।’

‘সাহস পাসনি কেন?’

‘বাড়ি ফিরতে হবে। যদি নেশায় উলটো-পালটা কিছু হয়। উঠে বাড়ি যেতে না পারি।’

‘তোর নিজের ওপর এত কনফিডেন্স কম?’

‘খুব সামান্য—জাস্ট টাচ বলতে পারো আঙ্কেল। আসলে ভয় করছিল।’

‘ভেরি গুড। কার সঙ্গে?’

‘অভিনব, গুড্ডু, বিনায়করা ছিল। ঐশানির বার্থডে পার্টিতে। ওই একটুই। আর কোনওদিনও নয়।’

‘এলএসডি?’

‘নাম শুনেছি। দেখিনি।’

‘আর কোনও কেমিক্যাল ড্রাগস? ইয়াবা। ইয়াবা তো তোদের জেনারেশনের ইন’

‘না।’

‘দেখেছিস?’

‘অভিনব, সানিরা রেভ পার্টি করে। ওখানে চলে।’

‘রেভ পার্টিতে গেছিস?’

‘না।’

‘কেন?’

‘ইচ্ছে ছিল। টাকা নেই।’

‘বাড়িতে চেয়েছিলি?’

‘আমার বাবা-মা দেবে না। ওরা কোনও কিছুতেই টাকা দেবে না। রেভ পার্টি কেন, বার্থডে পার্টিতেও যেতে পারি না।’

‘সত্যি বলছিস?’

‘সামনে বসে আছে জিগ্যেস করে নাও। ক-টাকা দেয় মাসে।’

‘অভিনব, সানিওরা তো স্পনসর করে।’

‘জানি। অনেকে যায়। ওরা তাদের ভিখিরি-বাঙালি বলে খিস্তিও মারে! আমি যাই না... তোমার কাছে কী প্রমাণ আছে? কোনও ছবি? আমি কিছু ট্রাই করছি—এমন কোনও ছবি?’

'না। ছবি তো তৈরি করা যায়, তা দিয়ে কী প্রমাণ করব?'

'তবে?'

'তুই মিথ্যে কথা বলছিস—তার প্রমাণ আছে আমার কাছে। তুই, আর্যনীল, তুই কেমিক্যাল ড্রাগস নিস। তুই কেমিক্যাল ড্রাগস কিনিস! আমার প্রশ্ন—এই কেমিক্যাল ড্রাগস তুই নিজের জন্য কিনিস? যদি কিনে থাকিস, তাহলে তোকে বন্ধ করতে হবে। ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট ওয়ার্নিং। আর যদি বিক্রি করিস...তবেও একই কথা বলব। পরের বার আর বলব না, কলার ধরে বাড়ি থেকে টেনে এনে লকআপে ঢুকিয়ে প্যাঁদাব। বল, কী করবি?'

আর্যনীল চুপ করে বসে থাকে।

'বল, কথা বল। আমার বেশি সময় নেই। তোর মতো ড্রামা করা ছেলে আমি অনেক দেখেছি। পর পর আরও আসবে। এখন চটপট তুই সত্যি কথা বল।'

আর্যনীল শান্ত মুখে তাকায়। কিন্তু অমিত্রসূদনের মনে হয়, আর্যর মুখমণ্ডল শান্ত নয়, ক্রমশ ফ্যাকাশে রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে। এই আর্যকে সে দেখেনি কোনওদিন।

'কী রে বল?'

'কী বলব?'

'কেমিক্যাল ড্রাগস কেন আনাস?'

'কাকে দিয়ে আনাব? কেউ আমার নাম বলেছে? আমি তাকে আনতে দিয়েছি?'

'না।'

'তাহলে কীভাবে আনাব?'

'অনলাইন। যেভাবে জামাকাপড় মোবাইল আনাস—সেভাবে?'

'আমি কি পাগল?'

'পাগল কিনা দেখবি? দেখ।'

বিশ্বদীপ অন্যদিকে তাকায়, 'শ্যামলবাবু আর্যনীল দাশগুপ্তর নামে যেটা জমা পড়েছে সেটা নিয়ে আসুন।'

শ্যামলবাবু একটা বড় রুলটানা খাতা নিয়ে আসে। খাতার ভাঁজে ছোট একটা সাদা খাম। বিশ্বদীপ খামটা টেনে নেয়, 'এই যে দেখ।'

আর্যনীল ও অমিত্রসূদন খামটির দিকে তাকায়। ছোট একটা সাদা খাম। খামের ওপর ঠিকানা লেখা। আর্যনীল দাশগুপ্ত...।

'এটা তোদের বাড়ির অ্যাড্রেস। তোর নামেই জিনিসটা আসছিল—'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কী বলবি?'

'আমার নামে কেউ পাঠাচ্ছিল। কিন্তু এটা আমার নয়।'

'তোর নয়? অথচ তোর নামে এত দামি একটা জিনিস পাঠাচ্ছে? কে পাঠাচ্ছে? তার নাম বল।'

‘আমি জানি না। খামের গায়েও তো কোনও নাম লেখা নেই।’

‘কোথা থেকে এটা আসছে?’ অমিত্রসূদন বলে।

‘নেদারল্যান্ডস থেকে।’

‘কে পাঠাচ্ছে তার নাম ঠিকানা নেই? আশ্চর্য!’ অমিত্রসূদন বলল।

‘না, নেই। থাকলে তো মিটেই যেত। কিন্তু কার কাছে ডেলিভারি হবে তার নাম আছে। এগুলো এভাবেই হয়।’

‘কেউ তো টাকা দিয়েছে এগুলো কিনতে। সেটা পেলেই তো কে পাঠাচ্ছে জানা যাবে।’ অমিত্রসূদন খামটা দু’হাতের মধ্যে নিয়ে পিঠ বেঁকিয়ে বসেছে। নাটকের রিহার্সালে কেউ কুঁজো হয়ে বসলে সে চিৎকার করেছে। আজ যেন আপনা হতে তার মেরুদণ্ড বেঁকে যাচ্ছে। ঝুঁকতে ঝুঁকতে সে যেন মাটিতে মিশে যাবে।

বিশ্বদীপ হাসে, ‘না, কিচ্ছু পাওয়া যাবে না। এটা ইন্টারনেটের ডার্কওয়েব থেকে বুক করা হয়েছে। ডার্কওয়েব হল ইন্টারনেটের ভেতর আর এক গোপন ইন্টারনেট। একটা গোপন প্ল্যাটফর্ম। ওখান থেকে গোপন সব কার্যকলাপ হয়। টেররিস্টরা টাকা পয়সা আদানপ্রদান করে, অস্ত্র কেনে। ড্রাগস বিক্রি হয়। পুরো ড্রাগস র‍্যাকেটটাই এই ডার্কওয়েবে তাদের যাবতীয় ডিল করে। পেমেন্ট হয় বিট কয়েন দিয়ে। বিট কয়েন জানেন তো? সারা পৃথিবী জুড়ে একটাই মুদ্রা। বিট কয়েন। ডলার পাউন্ড ইউরো ইয়েন টাকা সব বিট কয়েনে এক্সচেঞ্জ হয়ে ডার্কওয়েবে ঘোরে। অন্ধকার জগতের যাবতীয় লেনদেন হয় এখানে! কেমিক্যাল ড্রাগসটা এই ডার্কওয়েব-এ বিট কয়েন দিয়ে কেনা হয়েছে। আমার প্রশ্ন—কে কিনল? কেন কিনল? তোকে পাঠাল কেন?’

‘তুমি কি আমাকে কোয়েশ্চেন করছ, তাহলে বলব জানি না।’

‘কী জানিস না? ডার্কওয়েব বিষয়টা জানিস?’

‘হ্যাঁ জানি।’

‘ডার্কওয়েবে ঢুকতে পারিস?’

‘না। চেষ্টা করেছি। খুব টাফ।’

‘বিট কয়েন জানিস?’

‘জানি। আমার দু-একজন বন্ধুর বাবারা বিট কয়েনে টাকা রেখেছে। আমাকেও বলেছিল। আমি মাকে বলেছিলাম। বলেছিলাম টেন থাউজেন্ড রাখো, ক’দিনের মধ্যে ডবল হয়ে যাবে। মা বুঝতেই পারেনি। বিট কয়েনকে কোনও চিটফান্ড ভেবেছিল। আমি বোঝাতে পারিনি, বিট কয়েন একটা পেপার লেস কারেন্সি। টাকা ডলার ইউরোর দাম যেমন কমে বাড়ে বিট কয়েনের দাম শুধুই বেড়ে যায়। এটা দিয়ে সারা ওয়ার্ল্ড চলে। এত ভয়ের কিছু নেই।’

‘কারা রেখেছে, নাম বল?’

‘যতীন মালিক, আকাশ সরকার, দুরানি...।’

‘তোর বন্ধু? তোর ফেসবুকে আছে?’

‘আমাদের স্কুলের ছেলে, দুরানি আমার এফবিতে আছে।’

‘কেমন বন্ধু? সার্চ করলে পাব?

‘ভালো বন্ধু। সার্চ করো এখনই। খামের ভেতরে কী আছে আমি কি দেখতে পারি?’

‘খামটা খোলা—দেখ।’

আর্যনীল খামের ভেতর থেকে সুদৃশ্য একটা গ্রিটিংস কার্ড বের করে। কার্ডের ভাঁজে ছোট একটা প্ল্যাস্টিক প্যাকেট। প্যাকেটের মধ্যে একটা প্ল্যাস্টিক স্ট্রিপ। স্ট্রিপের ওপর দিয়ে দৃশ্যমান চারটে রঙিন ট্যাবলেট। আর্যনীল চোখের কাছাকাছি জিনিসটা তুলল। পিছনদিকে কী লেখা আছে পড়ার চেষ্টা করল। কয়েকটি শব্দ—ইংরেজি। ডব্লু বা ওয়াই।

টেবিলের ওপার থেকে ঝুঁকে পড়েছে অমিত্রসূদন। হাত বাড়িয়ে সে স্ট্রিপটি নিল। চশমা আঙুল দিয়ে চোখের সামনে ঠেলে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল। এসব তার বোধগম্যের বাইরে। অমিত্রসূদন নাটকের ছেলেমেয়েদের সংযমী হতে শেখায়। বোঝায় সিগারেট খেলে গলার স্বর স্বাভাবিক হয় না। শ্লেষ্মা অনেক আওয়াজকে আটকে দেয়। মদ খেও না। মদ শরীরকে ক্লান্ত করে। কিন্তু মদ খাওয়া, সিগারেট খাওয়ার ভঙ্গিকে দেখো, তাদের তৃপ্তি বোঝো, সুখটানের মানে জানো। মাতালদের আচরণ থেকে শেখো। নাটকে সব, সব কাজে লাগে। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।

আর্যনীল ট্যাবলেটের স্ট্রিপটা হাতে নিয়ে হাসল।

‘হাসছিস কেন? এটা তোর কাছে থাকা অবস্থায় ধরা পড়লে জেল কেউ আটকাতে পারবে না, জানিস?’

‘আমি এই কারণে হাসছি না।’

‘তবে?’ বিশ্বদীপ ভ্রূ কোঁচকায়।

এটা আমি আগেই দেখেছি?’

আর্যর কথায় বিশ্বদীপ সোজা হয়ে বসল, ‘কোথায়? কোথায় দেখেছিস?’

‘আমাদের বাড়িতে। পোস্টে এসেছিল। মাস খানেক বা তার আগে পিওন এসে মাকে দিয়ে গিয়েছিল। আমি তখন কলেজে ছিলাম। কলেজ থেকে ফিরতে মা খুব চিৎকার চেঁচামেচি করল। আমি মাকে বললাম, এটা আমি আনিনি, এটা কি আমি জানি না। তখনই আমি মাকে বলেছিলাম হতে পারে এটা কোনও ড্রাগস। নেশার জিনিস। মা আমাদের হাউস ফিজিশিয়ান ভট্টাচার্যজ্যেঠুকে ফোন করেছিল, তিনি সব শুনে বলেছিলেন ক্যানসারের ওষুধ। তারপর মা ওগুলো কমোডে ফেলে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছিল। সেই খামটা বা গ্রিটিংস কার্ডটা খুঁজলে এখনও হয়তো আমাদের বাড়িতে পাওয়া যেতে পারে। মা সব জমিয়ে রাখে। মাকে এক্ষুনি ফোন করে আমার কথা মিলিয়ে নিতে পারো।’

অমিত্রসূদন বলল, ‘আমি তো কিছু জানি না।’

‘এটা জানানোর মতো কোনও কথা নয়। একটা আরশোলা আমাদের বাড়িতে ঢুকেছে। আমরা মেরে সেটা ফেলে দিয়েছি। ব্যাস।’ আর্যনীল খুব দ্রুত জবাব দিল।

আর্যনীলের কথা শুনে বিশ্বদীপ খানিকটা সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘আর একবার করে বাজে চা খাওয়া যাক—কী বলিস আর্য!’

হাতের ইশারা করতেই চা আসে। তিনজনকেই চা দিয়ে যায়। অমিত্রসূদন দুধ চা খায় না। চিনি ছাড়া লিকার। কিন্তু আজ সে দুধ চায়ে চুমুক দেয়। চায়ে চুমুক দিয়ে বিশ্বদীপ বলল, ‘আচ্ছা ওই ট্যাবলেটগুলো দেখে তোর ঠিক কী মনে হয়েছিল? তুই কি কনর্ফাম ছিলিস ওটা কোনও ড্রাগস বা কী ধরনের ড্রাগস?’

'না, তেমন কিছু ভাবিনি। আমি বরং অন্যকিছু ভেবেছি।'

'অন্য কিছু? কী?'

আর্যনীল চুপ করে থাকে। গাল চুলকায়। মাথা নীচু করে।

'বল, কী বুঝেছিলিস, ওটা সাধারণ কোনও ড্রাগস নয়, কেমিক্যাল ড্রাগস। যা আগে কারও কাছে কোনওভাবে দেখেছিস?'

'না, তা মনে হয়নি। ওটা মায়ের জন্য বলেছিলাম। মা চিৎকার করছিল—মাকে থামানোর জন্য।'

'তবে?' বিশ্বদীপের গলার স্বর তীক্ষ্ন।

'আমি ওটা সিলডেনাফিল গ্রুপের কোনও ওষুধ মনে করেছিলাম।'

'সিলডেনাফিল!'

'আমি ওদের চক্করে থাকি না, তাই কোনও বন্ধু বদমাইশি করে আমার বাড়ির অ্যাড্রেসে ওটা পাঠিয়েছে।'

'সিলডেনাফিল—ভায়াগ্রা বলতে চাইছিস? যৌনশক্তিবর্ধক!' বিশ্বদীপ আঁতকে উঠে বলল। 'হ্যাঁ রে তোর বন্ধুরা সিলডেনাফিল খায়! ওর সঙ্গে তো নেশার কোনও সম্পর্ক নেই।' বিশ্বদীপ নিজের কপাল আর চুল দু-হাতের তালুতে ঘষল। ঘষেই চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। 'এগুলো বুড়োরা খায়, অসুস্থ লোকজনের ওষুধ, পারভারটেড! ওরা খায় গুড পারফরমেন্সের জন্য, আর তোরা?'

'আমি নই।' আর্যনীলের মুখে রক্ত জমে।

'কেন খায়—?'

'জাস্ট অ্যাডভেঞ্চার!'

ওদের কথোপকথন শুনে অমিত্রসূদনের কান্না পাচ্ছিল। পৃথিবী কী দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সে যেন অন্ধ! নিজের সন্তানকে চিনতে পারছে না।

বিশ্বদীপ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'শোন, তোকে বলি, ওটা কেমিক্যাল ড্রাগসই ছিল। ওটা তোর কাছে আসার আগেই আমাদের কাছে ইনফরমেশন এসে গিয়েছিল আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। মানে তোর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। দেখছিলাম, ওটা নিয়ে তুই কী করিস।'

'কী দেখলে?'

'ওই চারটে জিনিস তোর হজম করার মতো ক্ষমতা নেই। অত দামের জিনিস! নিশ্চয়ই কিছু কনজিউম করবি, কিছুটা বিক্রি করবি। কিন্তু তোর কাছে কোনও রেসপন্সই পেলাম না। এফেক্ট তো পরের কথা। আমরা বুঝতে পারছিলাম না। ব্যাপারটা কী হল? এরপর এই কনসাইনমেন্টটা এল। সাতদিন আগেই এসেছে। আমরা দেখছিলাম, তুই কীভাবে, কত রাত্তির পর্যন্ত কম্পিউটারে থাকিস। কোন কোন সাইটে যাস। আমরা তোর কেবল অপারেটরের সঙ্গে কথা বলেছি। তোকে ফলো করেছি। কিন্তু কিছুই পাচ্ছিলাম না। তাই তোকে লোক পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে এলাম। তুই সঠিকটা বলতে পারবি—আমি তো জানি না তুই কত গভীর জলের মাছ।'

আর্যনীল বলল, 'সত্যি আমি কিছু জানি না আঙ্কেল।'

‘আমি তোর কথা ফিফটি পারসেন্ট বিশ্বাস করছি। হয়তো এমন হতে পারে, তোরা বন্ধুরা মিলে গ্রুপ করে জিনিসটা আনিয়েছিস। সবাই মিলে টাকা তুলেছিস। সবাই মিলে কনজিউম করবি ভেবেছিলিস—এটাও জাস্ট অ্যাডভেঞ্চার।’

কথার মাঝে আর্যনীল কিছু বলতে যাচ্ছিল। হাত তুলে বিশ্বদীপ থামায়। ‘আমি যা বলছি, ভালো করে শোন। যদি এটা করে থাকিস, ব্যস! এখানেই থেমে যা। দু-দুবার হয়ে গেল। প্রথমবার তোর কাছে পাঠিয়েছি। কিন্তু আমরা আর জিনিসটার ট্রেস পাইনি। তোর কাছে শুনলাম সেটা কমোডে ফেলে দিয়েছিস। আমি এক্ষুনি তোর মাকে জেরা করতে পারি। সেটা মনে হয় তোর জন্য ভালো হবে না। তাই করলাম না। দ্বিতীয়বার তোকে পাঠাইনি, প্রমাণ হিসেবে আমাদের কাছে রেখেছি। তোকে ডেকে ওয়ার্নিং দিলাম। এটা লাস্ট ওয়ার্নিং। আমরা তোদের এই জাস্ট অ্যাডভেঞ্চার মেনে নেব না। এরপরে এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার করলে, তার শাস্তি তোকে পেতে হবে। মনে রাখিস, ধরা পড়লে জেল। কোনও বাবা, কোনও পলিটিক্যাল কানেকশন, কিছু করতে পারবে না। এবার বল, তুই কী বলছিলিস?’

আর্যনীল খুব ঠান্ডা আর শান্ত গলায় বলল, ‘যদি বলি, এটা আমি বা আমরা কিনিনি। যদি বলি, আঙ্কেল এটা আমার অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে কেউ আমাকে ফাঁসাতে চাইছে। সেক্ষেত্রে আমি কোথায় কমপ্লেন করব? তোমার কাছে?’

বিশ্বদীপ স্থির চোখে আর্যনীলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ‘তুই ঠিক বলছিস?’

‘প্লিজ, আমাকে বিশ্বাস করো। আমার বাড়িতে প্রথম যেটা এসেছিল, আমি তোমাকে তার কথা বললাম। আমি কী ভেবেছিলাম, সেটাও তোমাকে বললাম। প্লিজ আঙ্কেল এটা আমাকে কেউ ফাঁসাতে চাইছে।’

‘তোকে কি আমি বিশ্বাস করতে পারি?’

‘তুমি এক্ষুনি আমার মাকে ফোন করো। মা জানে। আমাদের বাড়িতে এখনও নিশ্চয়ই ওই গ্রিটিংস কার্ডটা আছে, এনভেলপও খুঁজলে পাওয়া যাবে।’

‘তাহলে বলব—চিন্তা আমার বেড়ে গেল? কে তোকে এত টাকা খরচ করে ফাঁসাতে চাইছে? কে বা কারা? তুই বলতে পারবি? আজ নয়, বাড়ি যা। তোকে সবদিক ভেবে দেখার জন্য শুক্রবার পর্যন্ত সময় দিলাম। শনিবার এই টাইমে চলে আয়। আর শোন কোনও কথা কারও সঙ্গে শেয়ার করবি না। বন্ধুদের নামগুলো ভাব, কারণ কী হতে পারে, গেস কর। আমার মনে হচ্ছে তুই সত্যি বলছিস। আমি তোর সঙ্গে আছি। ঠিক হ্যায়, আজ তাহলে আয়। সাবধানে থাকিস।’

বিশ্বদীপ অমিত্রসূদনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, ‘আমার চিন্তা বেড়ে গেল। প্রথম থেকে পুরোটা আবার দেখতে হবে। শনিবার আসুন। আমি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলি। দেবেশ আসুক। ও কেসটা দেখছে। আর্যর সঙ্গে আপনি আসতেও পারেন, নাও পারেন। কোনও অসুবিধে নেই।’

‘না, না, আমি আসব। আপনি আমার ফোন নম্বর রাখবেন?’

‘আপনাদের সবার ফোন নম্বর আমার কাছে আছে। আপনি বরং আমারটা রাখুন।’ বিশ্বদীপ একটা কাগজে ওঁর ফোন নম্বর লিখে দিল। ‘একদিন আপনার সঙ্গে নাটক নিয়ে বসতে হবে।’ বিশ্বদীপ অমিত্রসূদন মুখে হাসল।

অমিত্রসূদনের মনে পড়ল আজ মঙ্গলবার। ঠিক ছ’টা থেকে রিহার্সাল।

বাইরে এসে অমিত্রসূদন দেখল, আর্যনীলের মতো চার পাঁচজন ছেলে বসে। মানুষ গভীর চিন্তামগ্ন। একজন দুস্থ তাঁর রুগণ ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুকি মারছেন। ছেলেটাকে দেখলেই বোঝা যায় ড্রাগ অ্যাডিক্টেড।

এ ঘরের পাশেই ল'সেল। সেখানে একজন দাঁড়িয়ে কঠিন মুখে তাদের দেখছে। হঠাৎ লোকটা আর্যনীলকে ডাকল, 'আজ তোমাকে প্রথম দেখলাম। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল? উনি নিশ্চয়ই তোমার বাবা। তোমার জন্য তোমার বাবাকে এখানে আসতে হল, কথাটা মনে রেখো। ড্রাগস নিয়ে ধরা পড়লে কত বছর জেল জানো? সারাটা জীবন ভোকাট্টা হয়ে যাবে। বাড়ি যাও। ভাবো। এই যে এদের দেখছ, সব ভালো ভালো স্টুডেন্ট। ভালো ভালো কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। এদের কিন্তু হাতে হ্যারিকেন। জেলে নেই বটে, কিন্তু এক অদৃশ্য জেলখানার মধ্যে এরা বন্দি। এদের নামে বড় বড় সব অ্যালিগেশন আছে। নারকোটিক্স সেল এদের জেলে ঢোকাচ্ছে না। কিন্তু জিনা হারাম করে রেখেছে। সপ্তাহে পাঁচদিন করে এখানে চক্কর কাটছে। ওই যে বাবাটাকে দেখো, ফল বিক্রি করে, কষ্ট করে ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িয়েছিলেন। কী মনে হয়, পাপ করেছিলেন উনি? এখন ছেলের জন্য নিত্য এসে হাতে পায়ে ধরছেন। ছেলেটা তো মরবে, বাপটাকে মেরে রেখে যাবে। যাও, বাড়ি যাও। ভাবো। এখনও সময় আছে। আইন কিন্তু অন্ধ। জীবন দেখবে না।'

আর্যনীল স্থির চোখে তাকিয়েছিল লোকটার দিকে। একনাগাড়ে কথা বলে লোকটা থামল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে খুব বিরক্ত মুখে হাতের ইশারায় ওদের চলে যেতে বলল। নীচে নেমে গাড়িতে ঢোকার আগে অমিত্রসূদন বলল, 'হ্যাঁ রে তুই কি ঠিক কথা বললি! —এতগুলো নেশা তুই করেছিস?

গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল আর্যনীল। জলের বোতল নিয়ে ঢক ঢক করে একটানা জল খেল। তারপর কানে হেডফোন গুঁজে সিটবেল্ট বেঁধে সিটটা যতটা পারল এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল।

আর অমিত্রসূদন বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। কলকাতা শহরটা যেন সে চিনতেই পারছে না। এত এত বদলে গেছে!

সারকারিনায় রিভলভিং স্টেজ এসেছিল। দৃশ্য থেকে কী দ্রুত দৃশ্যান্তর হচ্ছিল। সেসময় অবাক হয়ে অমিত্রসূদন দেখেছিল, কে জানে? গ্লাসনস্ত পেরেস্ত্রৈকা, বিশ্বায়ন, সারা পৃথিবী একটিই গ্রাম...

হঠাৎই অমিত্রসূদন দেখল লাল আলোতে স্তব্ধ তার গাড়ির পাশে শওকত হোসেন দাঁড়িয়ে। শওকত একজন বিশিষ্ট কবি ও পণ্ডিত মানুষ। কোরান, বাইবেল থেকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে তাঁর অবাধ বিচরণ। একবার অমিত্রসূদনের লেখা একটা নাটকের একটি ডায়লগ নিয়ে শওকতসাহেব গ্রিনরুমে এসে ছোট্ট একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেই ছোট্ট প্রশ্নটা আলোচনার সময় বেশ বড় হয়ে দেখা দিল, নাটকের তৃতীয় শো থেকে বিতর্কটা পঞ্চম শো পর্যন্ত চলেছিল। দেখা গেল, শওকতের যুক্তি ও বোধ অকাট্য। পরে অমিত্রসূদন নাটকের ওই অংশটি পরিবর্তন করে নেয়। খুব সম্মাননীয় ব্যক্তি কবি শওকত হোসেন। এর পর থেকে অমিত্রসূদনের সঙ্গে শওকত হোসেনের অন্তরের সম্পর্ক। এখানে ওঁকে দেখে অমিত্রসূদন ড্রাইভারকে একটু দাঁড়িয়ে যান।'

গাড়ির দরজা খুলে অমিত্রসূদন ডাকলেন মানুষটিকে। 'আরে শওকত সাহেব যাবেন কোথায়?'

'বাড়ি যাব।'

'চলুন, আমিও বাড়ি ফিরব।'

লাল আলো তখনও সবুজ হয়নি। অমিত্রসূদন গাড়ির দরজা খুলে দিল। শওকত হোসেন উঠে এলেন গাড়িতে। বললেন, 'আপনার রঙ্গীবিরঙ্গীর কার্ড পেয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন আমার বর্ধমান ইউনিভারসিটির সেমিনার ছিল, আমার আর নাটক দেখতে যাওয়া হয়ে উঠল না। নেক্সট শো কবে আছে? আমাকে আর কার্ড পাঠাতে হবে না। আমি ঠিক চলে যাব।'

'সামনের বুধবার গিরিশ মঞ্চে।'

'ঠিক আছে যাব।'

অমিত্রসূদন হাসল। বলল, 'তারপর, আপনার লেখালিখির খবর বলুন?'

প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেলেন শওকত হোসেন। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, বললেন, 'ঠিক কী বলব, বুঝতে পারছি না। লেখা হচ্ছে না বুঝলেন। কবিতা আমাকে দিয়েছে ছুটি। ইদানীং বিশ্বাসটা কোথাও নড়ে যাচ্ছে।'

একটু এগিয়ে হাত ধরল অমিত্রসূদন, 'কী হল? আপনাকে তো কখনও এমন বিষণ্ণ দেখিনি।'

হাসলেন কবি শওকত হোসেন, বললেন, 'বাড়িটা বিক্রির চেষ্টা করছি। আপনাদের পাড়ার উত্তমবাবুকে বলেছি। আশা করি হয়ে যাবে। আমি আর আপনার প্রতিবেশী থাকব না।'

'মানে?'

'পার্ক সার্কাসের দিকে একটা ফ্ল্যাট দেখেছি। থ্রি বেডরুম। ব্যালকনিটা বড়। সামনে বিশাল একটা ছাতিম গাছ আছে। প্রচুর পাখি। সারা বিকেল খুব কিচিরমিচির করে। ওখানে চলে যাব।'

'কেন যাবেন?'

'যেতে হবে তাই।' শওকত হোসেন আবার ম্লান হাসলেন।

হঠাৎ সামনে সিট থেকে কানে গোঁজা হেডফোন খুলে আর্যনীল ঘুরে বসে। 'আঙ্কেল ঈশান কেমন আছে? ছবি আঁকছে? ও কিন্তু আর্ট কলেজেই পড়বে—আমাকে বলেছে।'

'ঈশান! ভালোই আছে। তুমি কেমন আছ? পুরনো স্কুলে যাও?'

'না, অনেকদিন যাওয়া হয়নি।'

'কেন দু'দিন ছাড়া ছাড়া তো তোমাদের গানবাজানা হয়—রক ব্যান্ড—তুমি যাও না!'

'না, এখন আমার বেশির ভাগ বন্ধু কলকাতায় নেই তাই।' অদ্ভুত কায়দায় ঘাড় ঝাঁকায় আর্যনীল, এক ঝাঁকুনিতে বুঝিয়ে দেয়, তার নিস্পৃহতার কারণ।

কিন্তু অমিত্রসূদন ভেতর ভেতর ছটফট করে—শওকত হোসেন কিছু লুকাচ্ছে। কিন্তু আর্যনীলের সামনে সে শওকত হোসেনকে ঠিক জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারে না। হঠাৎ তার বুকের ভেতর কেমন এক দমচাপা ভাব। ড্রাইভারকে বলল, 'এসিটা একটু বাড়িয়ে দিন তো।'

সে যেন বুঝতে পারছে—কবি ভালো নেই! কবি না ভালো থাকলে ধুলোয় ভরবে এ-শহর! এ-শহরে যে বৃষ্টি আসবে না! বৃষ্টি হলেও হবে ধুলোবৃষ্টি!

আট

পার্টি ওর জন্য কী করেছে?

মাঝে মাঝে মদ খেয়ে এসে উত্তম নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে। শুধু প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের উত্তরে থাকে গর্জন। তীব্র গর্জন। রাত বারোটা বাজলে দারাসিং যে গর্জন করে, ঠিক সেই গর্জন।

বছর পাঁচ সাত আগেও বাজারের পুবদিকে রামবিলাসে একটা খাটাল ছিল। সেখানেই দারাসিং চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে থাকত। রামবিলাসের মায়া ছিল, সে তার ছ'টা গোরুর সঙ্গে এই ষাঁড়টাকেও খাবার দিয়ে যেত। শেষ বাজারের যত শাক পাতা পচা বাতিল সবজি নিয়ে এসে ওর মুখের সামনে ফেলে দিত। ও খেয়ে নিত। আর কোনও ঝামেলা ছিল না। একবার অসুখও করেছিল, তখন রামবিলাস ডাক্তার এনেছিল।

বেশ চলছিল। জায়গাটা প্রমোটিং হওয়ার নোটিশ পড়ল। প্রমোটার পাড়ার ছেলে সঞ্জয়। সেই সঞ্জু এসে রামবিলাসকে পরিষ্কার বলে গেল শহরের মধ্যে খাটাল রাখা যায় না। এটা বেআইনি। সঞ্জু বলেছিল, জায়গা খালি করে চলে যা। তোর খাটালে রাতে মদের আড্ডা বসে। রামবিলাস দেখেছিল রাতে সঞ্জুই এখানে দলবল নিয়ে এসে মদ খায়। রামবিলাস কাউন্সিলারের কাছে গিয়েছিল। কাউন্সিলার বলে দিল, না, না, শহরের মধ্যে খাটাল রাখা যাবে না। এই ওয়ার্ডে ম্যালেরিয়া লেগেই আছে, সবাই তোমার খাটালের কথা বলে। তুমি গরিব মানুষ, আমি কেসটা চাপা দিয়ে রেখেছিলাম আর পারছি না। কারণ ডেঙ্গু হচ্ছে। সঞ্জু বলল, দশ হাজার টাকা দিচ্ছি, কেটে পড়। রামবিলাসের কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীও তাই বলল যা পাচ্ছ তাই নিয়ে কেটে পড়। গ্রামের দিকে গিয়ে খাটাল বানাও। রামবিলাস একটা একটা করে গোরু বিক্রি করে দিল। সঞ্জু কোনও টাকা দিল না। কিছুদিন ঘর আগলে সে বসেছিল। বেশিদিন না, হঠাৎই একদিন চড় থাপ্পড় খেয়ে দেশে ফিরে গেল। খাটাল নেই, খাটালে গোরু নেই, দারাসিং একা হয়ে গেল। একা ভ্যাকা সে বাজারে বেরিয়ে পড়ল। ক্রমশ সে একটা নাম পেল—দারাসিং।

উত্তম বুঝে গেছে সবাই ভোগবাদ, সুবিধাবাদে ভেসে গেছে। এই শহরে বামপন্থা আর ফিরবে না। বামপন্থীরা এখন দিগভ্রান্ত হয়ে ছুটছে। সে এখন একা। নিজেকে পালটে নাও। দারাসিং বাজারে ঘুরে ঘুরে তোলা তোলে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দারাসিং নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। উত্তমও নিয়েছে। পার্টি যদি ওর জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিত, ওকে এই দালালি করতে হত না।

দারাসিংয়ের ওপর উত্তমের খুব রাগ। সবাই ভাবে ষাঁড়টা উত্তমের সাধের গাড়ির পিছন তুবড়ে দিয়েছে, বাইক উলটে দুধকুমারের পা ভেঙে দিয়েছে,—এই তার রাগের কারণ। কিন্তু তা নয়। উত্তম কেন যেন ওর খ্যাপামিকে ভয় করে। শেয়ার বাজারের ষাঁড়টার মতো এই দারাসিংও একদিন শুধু ঊর্ধ্বগতির লোভ দেখিয়ে সারা বিশ্বটা কিনে নেবে। সব সব

কিনে নেবে। মুনাফা আরও মুনাফা। সব বিক্রি হয়ে যাবে। ওর ওই সামনে উঁচিয়ে থাকা শিং বিদ্ধ করবে সত্যিকারের শুভবোধকে।

ক'দিন আগে রাস্তায় সংস্কৃত পণ্ডিত অমরেন্দ্র ভট্টাচার্যের মা ওকে দেখে ডাকল। বলল, 'উত্তম শুনছি ওই ষাঁড়টা তোমার অনেক ক্ষতি করেছে। আর তুমি নাকি তক্কে তক্কে আছ—ওকে মারবে?'

উত্তম হাসল, 'কে এসব বাজে কথা রটাচ্ছে বলুন তো ঠাকুমা? কার থেকে শুনলেন?'

'কথা তো হাওয়ায় ভাসে বাবা। তা তোমাদের ওই দারাসিং হল ধর্মের ষাঁড়। ওকে কাঠি ঘা করো না। ও শান্ত হয়ে যাবে। ওকে মারলে তোমার ইহকাল পরকালে অনেক দোষের ভাগীদার হবে।'

উত্তম হাসল। 'আমি তো পরকালে বিশ্বাস করি না ঠাকুমা।'

'সে তুমি যখন বামপন্থী ছিলে তখন বিশ্বাস করতে না। এখন তো চলতি হাওয়ার পন্থী। এদিকে তো সব কিছুতেই বরং বড্ড বেশি বিশ্বাস।'

অমরেন্দ্র ভট্টাচার্যের মায়ের কথা শুনে থমকে গেল উত্তম। আগে পার্টির কাগজ দিতে গেলে, এই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা ওকে ডেকে হাতে নাড়ু দিত। চাঁদা দিত। বলত, সব ভালো কাজই গোবিন্দের ইচ্ছায় হয়। তুমি গোবিন্দের কাজই করছ।

মনে প্রাণে বামপন্থী হয়েও সেদিন এই কথাগুলোয় উত্তমের খুব ভালো লাগত। মনে হত, সে ঠিক পথেই আছে।

'আপনি যান ঠাকুমা, ওকে কেউ মারবে না। করপোরেশনে খবর দেওয়া হয়েছে। ওরা এসে ওকে শান্ত হওয়ার ইঞ্জেকশন দিয়ে যাবে।'

'সে জানি। ইঞ্জেকশনে মানে ওর পিছনের একটা পা অবশ করে দেওয়া হবে, তাই তো? সে তোমাদের ধর্মে যা সয় তাই করো। কিন্তু ওর ধর্মভ্রষ্ট করার চেষ্টা করো না।'

'ধর্মভ্রষ্ট! ষাঁড়ের ধর্মভ্রষ্ট কী করে করব?'

বৃদ্ধামহিলা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, 'শুনলাম, এ এলাকার কয়েকজন মাতাল নাকি ঠিক করেছে, আগে ওকে কলাপাতায় মুড়ে চিলি চিকেন খাওয়াবে। চিলিচিকেন খাইয়ে ওর ধর্মভ্রষ্ট করবে। তারপর ওর ব্যবস্থা করবে।'

'চিলি চিকেন খাওয়াবে?' উত্তম হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না।

বৃদ্ধা মহিলা বললেন, 'হ্যাঁ শরৎবাবুর উপন্যাসে যেমন ছিল, আগে প্রেমের অভিনয় করে মেয়েটিকে ভালোবাসো, বিয়ে, ঘর-সংসারের লোভ দেখিয়ে ঘরছাড়া করো। আর একবার কুলত্যাগী হলে এবার তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারো। কেননা ও কুলটা! ওর কোনও ধর্ম নেই।' বৃদ্ধা মহিলা থামলেন, কঠিন চোখে উত্তমকে ভস্ম করে দিয়ে বললেন, 'ধর্মের ষাঁড় একবার যদি চিলি চিকেন খেয়ে ধর্মভ্রষ্ট হয়, তোমরা তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারবে—তাই তো?'

'কে বলল, আপনাকে এসব কথা? আজব ব্যাপার—ষাঁড়কে চিলি চিকেন খাওয়াব!'

'ষাঁড় নয়, ধর্মের ষাঁড়। কেউ শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করেছিল, সেটাই এখন আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকেই তোমরা জব্দ করতে চাইছ।'

উত্তম দু-হাত জোড় করে বলল, 'ঠাকুমা আমি কথা দিচ্ছি, কেউ এমন কাজ করতে পারবে না। আমি নিজে নজর রাখব।'

অমরেন্দ্র ভট্টাচার্যের মা চলে যেতে উত্তম এসে দারাসিংয়ের স্ট্যাচু হওয়ার জায়গায় দাঁড়াল। এখানে একটা লাইট পোস্ট আছে। কিন্তু তার আলোয় যেন তেমন জোর নেই। দেবার্চনদাকে বলতে হবে এই স্পটে একটা চার লাইটের বাতিস্তম্ভ লাগানো দরকার। ওই আলোতে রাত—দিন হয়ে যায়। বেশি আলো থাকলে ষাঁড়টা এখানে এসে গর্জাতে পারবে না। আর উত্তমের চোখেও রাস্তাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। রাতে ভিতে কেউ এসে এখানে দাঁড়ালে তার বাড়ি থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে।

ইদানীং তার কাছে সব কিছু ঝাপসা লাগে। এই যেমন কবি শওকত হোসেন। অত নামী লোক! এই পাড়ার একধারে ছিলেন। হঠাৎ সেদিন মানুষটা তাকে ডেকে বললেন, খদ্দের দেখতে, বাড়ি বিক্রি করে দেবেন। কি না, পার্ক সার্কাসের দিকে একটা ফ্ল্যাট কিনছেন। উত্তমের সঙ্গে শওকত হোসেনের অনেকদিনের সম্পর্ক। সে যখন বামপন্থী ছাত্র রাজনীতি করত তখন থেকে শওকত হোসেনকে চেনে। পাক্কা বামপন্থী মানুষ। খুব নামী কবি। সেই মানুষটার যে কী হল? মনে হল, বিরক্ত হয়েছেন কোথাও, নাকি ভয় পেয়েছেন? উত্তম লাভ ক্ষতির বাইরে গিয়ে বলল, কেন স্যার, অন্য কোনও অসুবিধে হচ্ছে? নির্দ্বিধায় আমাকে বলতে পারেন। আমি আছি।

'আমি আছি' বলার সময় উত্তমের গলার ভেতর কেমন যেন একটু কেঁপে উঠল। সত্যিই কি সে আছে? বেঁচে আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, এইটুকু, বাদবাকি? না, জানতে হবে কবি শওকত হোসেন কেন বাড়ি বিক্রি করে দিতে চাইছেন?

কেউ না জানুক, উত্তম তো উপলব্ধি করত পারে, এ-পাড়ায় একজন কবি আছেন বলেই, মাঝে মাঝে দু-একটা পাখি এসে মরা গাছে বসে।

নয়

শকুন্তলার মনে আজ সারাদিনে একটিও গানের কলি ভাসেনি। বরং সব সময় দুশ্চিন্তার কালো মেঘ যেন তার চারপাশে ঘিরে আছে। কেন এমন হল? সে কি কিছু কম দিল এই সংসারে? ফাঁকি কোথায়? মাঝে মাঝে নিজেকে সে প্রশ্ন করে—বাড়িতে বাবা মায়ের শিক্ষা বড়, না বাইরের জগতের হাতছানি?

কাল তার মনে হচ্ছিল একবার ছুটে গিয়ে আর্যর স্কুলের প্রিন্সিপাল স্যারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, আপনি বলতেন না—সজাগ থাকুন, কিন্তু সন্দেহ করবেন না। সন্দেহ করিনি, কিন্তু সজাগ থেকেও কিছু করতে পারিনি। দেখুন, দেখুন, আমার বাড়িতে পুলিশ এসেছে। আজ বাপ আর ছেলে লালবাজারে গেছে হাজিরা দিতে।

ওর মাথার ভেতর কেউ যেন কাল থেকে গজাল পুঁতেছে।

ওই ওরা ফিরল।

গাড়ি ফিরল। কিন্তু তার বাড়ির সামনে না দাঁড়িয়ে গাড়িটা সোজা চলে গেল পাড়ার ভেতরে। কিছুক্ষণ পরে গাড়ি এসে দাঁড়াল তাদের বাড়ির সামনে। শকুন্তলা দেখল, খুব শান্ত ভঙ্গিতে বাপ আর ছেলে গাড়ি থেকে নামল। দরজা খুলেই রেখেছিল সে, সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে ওপরে উঠে এল আর্য। একদম স্বাভাবিক। জুতো খুলতে খুলতে মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। শকুন্তলা বলল, 'কী রে, ওরা কী বলল?'

'বলল, তোমার মাকে বোলো, ভালো করে পাস্তা বানানো শিখতে। কিপটেমি করলে পোস্তও হয় না, পাস্তাও হয় না।'

আর্য নিজের ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে দিল। গ্যারেজ বন্ধ করে, ড্রাইভারের টাকা মিটিয়ে ধীর পায়ে উঠে এল অমিত্রসূদন। ওর মুখটা কালো হয়ে আছে। শকুন্তলার বুকের ভেতর, গলার কাছে কথা আটকে। ওর দিকে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। আর্যকে দেখল, ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ফ্রিজ খুলে একটা জলের বোতল নিয়ে দোতলা জুড়ে চক্কর কাটছে। অমিত্রসূদন হাত পা মুখ ধুয়ে কলঘর থেকে বেরিয়ে নিজের পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল। শকুন্তলা নীচু স্বরে আর্যকে আবার বলল, 'কী রে কী হল?'

'কী আবার হবে? কেউ আমার নামে পিন করে এসেছিল।'

'তোর নামে কেন?'

'আমার নামটা সুন্দর বলে।' আর্য বিরক্তির সুরে কথাটা ছুড়ে দিয়ে আবার ঘরে ঢুকে গেল।

শকুন্তলা আর পারল না, পড়ার ঘরে অমিত্রসূদনের কাছে হাজির হল। 'ওখান থেকে কখন বেরুলে, বেরিয়ে একটা ফোন করলে না?'

'আসলে গাড়িতে কথা বলতে চাইনি। তাছাড়া শওকত সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'উনি কিছু জিগ্যেস করছিলেন নাকি, কোথায় গিয়েছিলে?'

'না, না, তা কেন জিগ্যেস করবেন? আচ্ছা, আমাদের বাড়িতে এর মধ্যে কোনও পার্সেল এসেছিল?'

'পার্সেল?'

'হ্যাঁ, তাতে ছোট ছোট চারটে রঙিন ট্যাবলেট ছিল?'

'সে তো এর মধ্যে নয়, অনেকদিন আগে, ওর কোনও শয়তান বন্ধু পাঠিয়েছিল। ক্যান্সারের ব্যথা কমানোর ওষুধ, পেন কিলার, অন লাইনে বুক করে পাঠিয়েছিল।'

অমিত্রসূদন চোখ বন্ধ করল, 'কই আমি তো শুনিনি?'

'তোমাকে আবার কী বলব—তোমার শোনার সময় আছে? আমি ডাক্তার ভট্টাচার্যকে ফোন করেছিলাম। উনি বললেন, হাই ডোজের পেন কিলার। আমি নিয়ে কমোডে ফেলে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছি।'

'ওটা পেন কিলার নয়। ডাক্তার ভট্টাচার্য মুখে মুখে শুনে ঠিক বুঝতে পারেননি, ওটা কেমিক্যাল ড্রাগস।'

'দেখো আমার প্রথমে ওরমই কিছু মনে হয়েছিল, আজকাল টিভিতে দেখায়, স্কুল কলেজের ছেলেরা ট্যাবলেট খেয়ে নেশা করে। আমি কিন্তু তাই মনে করেছিলাম। কেমিক্যাল টেমিক্যাল জানতাম না। আমি ভেবেছিলাম, এই শয়তান হয়তো ওসব টেস্ট করে না। কিন্তু ডাক্তার ভট্টাচার্য যখন বললেন, ওটা ক্যানসারের পেন কিলার, তখন ভাবলাম, কেউ বাঁদরামি করছে। ওদের তো সব হাই ক্লাস বাঁদরামি। ওটাও সেই রকম কিছু।'

'অনেক টাকার জিনিস ওটা। এত টাকা খরচ করে ওগুলো কে পাঠাবে?'

‘শোনো, ওদের কাছে টাকার কোনও দাম নেই। শুনবে? ওই যে কীর্তি শা। কীর্তিকে ওরা বুলি করে। ওর বার্থ ডে সেলিব্রেট করতে ওরা বড়দের হাগিস নিয়ে এসেছিল। সেটা কীর্তিকে পরতে হয়েছিল ক্লাসরুমে, আর ওরা সবাই একটা করে বড়দের হাগিস মাথায় পরে বার্থ ডে কেক কেটেছে। এবার বলো, বড়দের এক একটা হাগিসের কত দাম, ওরা টাকা নষ্ট করে ওই হাগিস পরে নেচেছে।’

আগে একথা শুনলে অমিত্রসূদন হাসত। হাসতে হাসতে ছেলেকে জানতে, সময়কে জানতে আরও আরও প্রশ্ন করত। জীবন তো এমনই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কত রঙে, কত ঢঙে পালটে যায়। কত বিস্ময়! এখন যেন অমিত্রসূদন বিস্মিত হতে ভয় পাচ্ছে। এখন আর তার কাছে বিস্ময় মানে আনন্দ নয়, দম বন্ধ হয়ে আসা উৎকণ্ঠা! আশঙ্কা! ভয়! সে কোনওরকমে বলল, ‘তোমার ছেলের নামে আগে ওই পার্সেল এসেছিল নেদারল্যান্ডস থেকে, সেটা ওরা জানত, ওটা আবারও এসেছে, ওরা তারই খোঁজ নিচ্ছে।’

‘নেদারলান্ডস! হ্যাঁ তখনও আর্য দেখে বলেছিল, ওটা নেদারল্যান্ডস থেকে এসেছে, খামের ওপর ওর নাম ঠিকানা ছিল। কে পাঠিয়েছিল লেখা ছিল না। স্ট্যাম্প ছিল নেদারল্যান্ডসের। তা এর জন্যে আর্যকে ডাকবে কেন? যে পাঠিয়েছে তাকে ডাকুক, তাকে ধরুক।’

অমিত্রসূদন চোখ তুলে শকুন্তলার দিকে তাকাল। ‘তোমার রান্না হয়ে গেছে? খাবার ব্যবস্থা করো। তুমি তো অনলাইনে জিনিস কেনো, বোম্বে দিল্লি থেকে যেমন আসে তেমন আমেরিকা, ইংল্যান্ড, চায়না থেকেও আসে। এটাও তেমন অনলাইনে কেনা হয়েছে। সেটা কলকাতা থেকে বসেও হতে পারে, এ-বাড়ি থেকে বসেও হতে পারে।’

কথাটা শুনে ধপ করে বসে পড়ল শকুন্তলা। ‘বলো কী? এই বাড়িতে বসে কেনা হয়েছে? কেমিক্যাল ড্রাগস!’

আজকাল অনলাইনে যেখানে খুশি বসে কেনা যেতে পারে। তেমন এ-বাড়িতে বসেও কেনা যেতে পারে।’

‘ওহ!’ কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হয় শকুন্তলা। ‘তুমি বললে না কেন, ও কেনেনি। ওর ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড নেই। তাহলে কিনবে কী করে? টাকা কে দেবে?’

‘এটা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডে কেনা হয়নি। ডার্কওয়েব ইউজ করে বিট কয়েনে কেনা হয়েছে।’

‘বিট কয়েন! সেই যেটা ওর বন্ধুর বাবারা কেনে, ভার্চুয়াল টাকা? বিট কয়েন তো আমাদের নেই।’

‘টাকা না থাকুক সে টাকার পাপ আছে। বিট কয়েন নেই, ডার্কওয়েব নেই...।’

শকুন্তলা চুপ করে মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে। এই তো বছর দুয়েক আগে একদিন বাড়ি ফিরে আর্যনীল বলেছিল বিট কয়েনের কথা। ওর বন্ধু রোহিত দাসের বাবা বিট কয়েনে টাকা রেখে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। ওরা একটা বিএমডব্লু গাড়ি কিনেছে, প্রায় এক কোটি টাকা গাড়িটার দাম। আর্যনীল বেশ গলাবাজি করে বলেছিল, এবার তো বাবা বলতে পারবে না, ওরা অবাঙালি ব্যবসায়ী পরিবার, ওদের কাছে এসব সামান্য টাকা, ওরা গ্যাম্বলিং করতে পারে। আমরা পারি না। রোহিতরা দাস। একদম পাতি বাঙালি। আসলে ওরা রিস্ক নিতে জানে। ভিতু নয়। আর্যর কথা শুনে অমিত্রসূদন সেদিন

হেসেছিল। শকুন্তলা ঠাকুর প্রণাম করে—সত্যি সত্যি সেদিন যদি লোভে পড়ে আমরা বিট কয়েন কিনতাম, তাহলে আজ আর বাঁচতে পারতাম না।

অমিত্রসূদন বলল, 'শনিবার যেতে হবে।'

'আবার? আবার কেন?'

'তোমার ছেলেকে ভাবতে বলেছে কে বা কারা ওগুলো পাঠাতে পারে?'

শকুন্তলা ঠিকরে ওঠে, 'সেটা ওরা খুঁজে বের করুক। আমাদের ঘাড়ে দিচ্ছে কেন? তুমি কিছু বলতে পারলে না?'

'শনিবার ও যাবে, ও-ই বলবে।' অমিত্রসূদন হতাশ গলায় বলল, 'তবে এখন এই আসা-যাওয়া চলতেই থাকবে।'

শকুন্তলা গুম হয়ে বসে থাকে।

বাইরে আর্যর গলা, 'খেতে দাও, আমি বেরুবো।'

খেতে খেতে আর্যনীল বলল, 'তুমি মনে হয় একটু বেশিই ভয় পাচ্ছ। অত টেনশন করার কিছু নেই।'

শকুন্তলা কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে আর্য বলল, 'মা, তুমি চাপ নিও না। আমি ফেঁসেছি। বাবা সব কিছু নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে, সব বুঝতে পারছে। আমি কোনও মিথ্যে কথা তোমাকে এসে বলছি না, কোনও কথা তোমার কাছে চেপে যাচ্ছি না। সব কথা তুমি বাবার কাছ থেকে জেনে নিতে পারো। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না। মনে করো আমি শুধু মিথ্যে কথা বলি। তাই, আমাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্তর থেকে রেহাই দাও। যা শোনার বাবার কাছ থেকে শুনে নেবে।'

শকুন্তলা কঠিন চোখে আর্যনীলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আর বাবি, তুমিও ইচ্ছে করলে শনিবার নাও যেতে পারো, আমার কোনও অসুবিধে হবে না। আমি সামলাতে পারব।'

'সেটা আমি দেখব।' অমিত্রসূদন বলল।

'তোমার আজ রিহার্সাল নেই? প্লিজ তোমরা একটু স্বাভাবিক হও। তোমরা এমন ভাব করছ, যেন আমি অপরাধী—'

অমিত্রসূদন মুখ তুলে আর্যনীলের দিকে তাকাতে গিয়েও তাকাল না। ওর কেমন যেন ঘেন্না হল, হ্যাঁ স্বাভাবিক থাকতে হবে। তুই স্বাভাবিক! নির্দ্ধিধায় তুই বলে যেতে পারিস গাঁজা খেয়েছি। চরস খেয়েছি। হেরোইন ব্রাউন সুগার ট্রাই করেছি। ইয়াবা। না। এলএসডি। না। কেমিক্যাল ড্রাগস! না। আজ 'না' হয়েছে, কাল যদি চাপে পড়ে ওগুলো 'হ্যাঁ' হয়! তখন? তখন? অমিত্রসূদনের শরীরের ভেতর কেমন তালগোল পাকায়, খারাপ লাগে, বমি আসে। ওঁক তুলে বেসিনের দিকে উঠে যায়।

দশ

অমিত্রসূদন কাল রিহার্সালে যায়নি। রিমিতা দেবজ্যোতি ফোন করেছিল ওকে। দুজনের কাছেই স্পষ্ট হয়নি, এমন জরুরি দিনে কেন অমিত্রসূদন এল না। আজ ফোন করে শুনেছে অফিস যায়নি, ওরা তাই বিনা ফোনেই বিকেলে হাজির হল।

রিমিতাকে শকুন্তলা ঠিক সহ্য করতে পারে না।

রিমিতা অদ্ভুত মেয়ে! ও যেন অমিত্রসূদনের হাতের লাঠি। সবসময় ওর হাতের কাছে সেঁটে থাকে। একসঙ্গে নাটক করিস কর, কিন্তু এত দখলদারি কেন? যেন অমিত্রসূদনের সব কিছু ওর। কী করে, কেমন করে যেন ও অমিত্রসূদনকে সবটাই দেখতে পায়। আর অমিত্রসূদনও যেন সারাক্ষণ ওর চোখের তারায় বসানো থাকে। একটু নড়লেই রিমিতা বুঝতে পারে, ওর কী চাই? ঠিক হাতের সামনে এগিয়ে দেয়। গুছিয়ে দেয়। মানুষটার বড় ভুলো মন। সবসময় কিছু না কিছু ভুলছে, হারাচ্ছে, আর রিমিতা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

রিমিতার একটা স্বভাব খুব খারাপ। বড্ড মুখের ওপর কথা বলে, শাসন করে। ওর শাসন করার যেন কোনও সীমারেখা নেই। অমিত্রসূদন কোথায় গিয়ে লোভে পড়ে ছ'টা রসগোল্লা খেয়েছে শুনে সকলের সামনেই নাকি ধমকেছে।

আশ্চর্য!

রঙ্গীবিরঙ্গী নাটকটা তৈরির সময় রঙ্গী-র চরিত্রে অমিত্রসূদন রিমিতাকেই ভেবেছিল। গ্রুপের সবচেয়ে ভালো অভিনেত্রী নায়িকার চরিত্র করবে, এটাই দস্তুর। অথচ, রিমিতা বলল, না রঙ্গী করুক সুপর্ণা। ওকে বেশ মানাবে। চরিত্রটা যতটা সুন্দরী ছিপছিপে দাবী করছে সেটা ও নয়। ডলপুতুলের মতো দেখতে সুপর্ণা। গানের গলাও ভালো। এই চরিত্রটা ও-ই করুক। অমিত্রসূদন বলেছিল, চেহারা ও গলার খামতি তুমি অভিনয় দিয়ে পুষিয়ে দেবে বলে আমার বিশ্বাস। আর রিমিতা বলেছিল, আমার বিশ্বাস আমার থেকে দর্শক ওকেই বেশি নেবে। রঙ্গীর সামনে দাঁড়িয়ে শিল্পী যখন ওর রূপবর্ণনা করবে সেখানে আমি! না, না, হতেই পারে না।

শকুন্তলা জানে এবং মানে রিমিতা অসাধারণ অভিনেত্রী। আর নাটক অন্ত প্রাণ। কিন্তু গ্রুপের একটা ডিসিপ্লিন আছে তো। দলের সবাই যখন চাইছে ও রঙ্গী করুক, তখন ও কে বেঁকে বসার?

অনেক তর্ক বিতর্কের পর অমিত্রসূদন মেনে নিয়েছিল। বলেছিল, ঠিক আছে ওকে ওর মতো ভাবতে দাও। ও নায়িকা হতে চাইছে না, নায়িকা থেকে সরতে চাইছে। ওর নাটকবোধ ওর নাটক-বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে, ওকে আমাদের সবার সম্মান করা উচিত।

শকুন্তলা এই কথাগুলো শুনে আড়ালে মুখ বেঁকিয়েছিল। সম্মান! স্বামী সংসার ছেড়ে দিল। কি না নাটক করবে! ওর স্বামী সংসার ওকে করতে দেবে না। কী নির্লিপ্তভাবে সব ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। শকুন্তলা ওকে বুঝিয়েছিল, একা একা বাঁচা কঠিন। ও স্পষ্ট গলায় বলেছিল, একা একা বাঁচব কেন বউদি, নাটক আছে তো। শকুন্তলা অবাক হয়েছিল। একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট কিনে রিমিতা থাকা শুরু করল। প্রথমদিকে অমিত্রসূদনের সঙ্গে শকুন্তলা ওর ফ্ল্যাটে গিয়েছে কয়েকবার। দেখেছে, সেই একার সংসারেও কেমন উড়নচণ্ডীভাব। চা আছে তো চিনি নেই। চা চিনি দুধ থাকল তো গ্যাস বুক করতে ভুলে গেছে। শকুন্তলা বলেছিল, একটা ইন্ডাকশন কিনে রাখো। গ্যাস ফুরিয়ে গেলেও কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। রিমিতা হেসেছিল, বলেছিল, বই ছাড়া এই ফ্ল্যাটে আমি আর কিছুই ঢোকাতে চাই না।

বই! বই!

রিমিতার কথায় অমিত্রসূদনের মুখে শকুন্তলা কেমন যেন এক মুগ্ধতার আলো দেখেছিল। শকুন্তলার মনে হয়েছিল, এই কথাগুলো রিমিতা বলছে না, যেন অমিত্রসূদনই বলছে।

অমিত্রসূদন তো মনে প্রাণে এমন মেয়েই চায়। যে ওর সাধনসঙ্গিনী হবে। রিমিতা তো তেমনই! সেদিন থেকে শকুন্তলা ওকে সহ্য করতে পারে না। রিমিতার কথা উঠতেই জ্বলে পুড়ে যায়। মাঝে মাঝে ভয় করে, অমিত্রসূদনের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক গড়ে উঠছে না তো? পারস্পরিক এত নির্ভরতা একমাত্র দাম্পত্যেই সম্ভব।

শকুন্তলা ভাবে, অমিত্রসূদন কেন রিমিতার এত রাগ ভাঙায়? শকুন্তলার জীবনে নাটক নেই, যা আছে তা একমাত্র স্বামী সন্তান নিয়ে এই সংসার। সেখানে সে কোনও অভিনয়ের স্থান দেবে না। ওর সামনে ওরা দুজন অভিনয় করছে না তো? যারা অভিনয় করে তাদের শকুন্তলা ভয় পায়— ওরা গোপন করতে জানে, নিজেকে লুকাতে জানে। ওরা চোখের সামনে মিথ্যে দেখায় সত্যি করে। তেমন কিছু হচ্ছে না তো তারই চোখের সামনে? এই গ্রুপে আরও পাঁচজন মেয়ে আছে? তাহলে রিমিতাকে সবাই কেন সামনে রেখে কথা বলে? শুধুই কি ভালো অভিনেত্রী বলে? অমিত্রসূদন একদিন ছিটকে উঠে বলেছিল, নাটকের জন্য ওর আত্মত্যাগ অনেক। শকুন্তলা বলেছিল, নাটকের জন্য, না গ্রুপের জন্য? কথাটা শুনে অমিত্রসূদন পাক্কা দু-দিন গুম মেরে ছিল।

কাল অমিত্রসূদন রিহার্সালে যায়নি বলে রিমিতা আজ সোজা বাড়ি চলে এল!

অন্যসময় হলে শকুন্তলা এটা নিয়ে অনেক অনেক ভাবত। কিন্তু আজ তার ভেতর থেকে কেমন যেন চলটা উঠে গেছে। আনন্দ ও গর্বের রং চটে গেছে। তাই আজ যেন তার রিমিতাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছিল। বলল, বসো, তোমরা কথা বলো আমি চা করি?

রিমিতা বলল, 'না বউদি তুমি এখানে বসো, কী হয়েছে বলো তো, উনি কাল রিহার্সালে এলেন না—আবার অফিসেও যাননি। কী এমন হল?'

শকুন্তলা বলল, 'ওনার শরীরটা ভালো নেই?'

'শরীর ভালো নেই! কী হয়েছে? দেখি—' বলে শকুন্তলা সরাসরি অমিত্রসূদনের কপালে হাত রাখল। 'না, জ্বরজারি কিছু তো মনে হচ্ছে না।'

অমিত্রসূদন হাসল, 'তুমি তো ডাক্তার হয়ে গেলে রিমি!'

শকুন্তলার চোখ জ্বলছে, হৃদয়ও, বলল, 'বসো, চা করি।'

রিমিতা বলল, 'না, বউদি তোমরা আমার কাছ থেকে কিছু লুকোচ্ছ। বিশ্বাস করো, এই এত বছরে আমি প্রথম ওনাকে দেখলাম রিহার্সালে এলেন না। কম দিন তো হল না আমার গ্রুপে। সত্যি আমার চিন্তা হচ্ছিল। তাই ছুটে এলাম।'

রিমিতার সঙ্গে আসা মিন্টুও কলকল করে উঠল, 'সত্যি বউদি এত বছর দাদাকে দেখছি, দাদা কলকাতায় আছে, অথচ গ্রুপে আসেনি এমন দিন নেই, কাল হঠাৎ এল না দেখে আমরা সবাই খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

অমিত্রসূদন মৃদু ধমকালেন, 'অ্যাই মিন্টু থাম, কেন গতবছর আমার শালির বিয়ের জন্য আমি শোয়ের আগের দিন গ্রুপ মিটিংয়ে ছিলাম না, মনে করে দেখ।'

মিন্টু বলল, 'সেটার স্পষ্ট একটা কারণ ছিল, কিন্তু কাল—'

অমিত্রসূদন বলল, 'সত্যি আমার শরীরটা খারাপ করেছিল, ভাবলাম একটু রেস্ট নিই। তাই।'

চা এল। গরম গরম সিঙারা। আর্যই মোড়ের মাথার দোকান থেকে সিঙারা নিয়ে এসেছে।

সিঙারায় কামড় দিয়ে রিমিতা বলল, 'সত্যি সত্যি আপনার শরীর খারাপ, এটা বিশ্বাস করলে আসার সময় হাতে করে এক কিলো আপেল ঝুলিয়ে নিয়ে আসতাম।'

অমিত্রসূদন চায়ে চুমুক দিল। এদিকে শকুন্তলার মুখও চায়ের কাপ ছুঁয়ে।

রিমিতা বলল, 'আপনিই বলেছেন, আমরা সবাই এক পরিবারের মানুষ। সবার সুখে দুঃখে সবাই থাকব। আজ আপনিই সে-কথা লঙ্ঘন করলেন। সত্যি কারণটা যদি খুব পারসোনাল না হয় তাহলে বলতে পারতেন। আমরা হয়তো সমস্যার সমাধান করতে পারতাম না। বউদির সঙ্গে আপনার ঝগড়া হলেও আমরা সেটা নিয়ে খানিক চিন্তামুক্ত হতে পারতাম। ভাবতাম, কাল মিটে যাবে, পরের দিন আবার আসবেন। কিন্তু যদি অন্য কিছু হয়, সেটা আপনারা গোপন করেন—তাহলে পরিবারটা কোথায় থাকল?'

অমিত্রসূদন বলল, 'সিঙারাটা বেশ ভালো। সকালে দোকানটায় দারুণ জিলিপি বানায়।'

'আপনি আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না। আবারও বলি খুব পারসোনাল বিষয় হলে, মুখ ফুটে সেটাই বলুন। আমরা সহমর্মী, আপনার থেকে বিশদ জানতে চাইব না, চুপ করে আপনার পাশে থাকব। কিন্তু এভাবে মুখ বন্ধ করে কষ্ট পাবেন না।'

হঠাৎই ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল আর্য। ঘরের ভেতর সে পা না রেখে বলল, 'রিমিতা আন্টি, আমি বলি—বাবা আমার জন্য রিহার্সালে যায়নি। আমাকে নিয়ে বাবার একটা সমস্যা হয়েছে।'

আর্যর কথা থামিয়ে শকুন্তলা বলল, 'আর্য ঘরে যাও। আমাদের কথার মাঝে তুমি কথা বলতে আসবে না।'

আর্য বলল, 'সমস্যাটা কী তোমাদের বলি—পরশু আমাদের কলেজে ফেস্ট ছিল। আমার ফিরতে রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। সেটা হয়তো ম্যানেজ হয়ে যেত। আমি বন্ধুদের সঙ্গে একটু আধটু ড্রিঙ্ক করেছিলাম। তারপর মারপিট করেছিলাম। সব মিলিয়ে বাবা খুব আপসেট। আমি ক্ষমা চেয়েছি। বলেছি, আর কোনওদিন হবে না। এটাই ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট। আমি সরি। আমি তোমাদেরও বলে দিলাম।'

অমিত্রসূদন অবাক চোখে আর্যনীলের দিকে তাকিয়ে—কী বলছে আর্য! এমন করে বানিয়ে বানিয়ে সত্যকে মিথ্যে দিয়ে আড়াল করছে?

আর্যর কথা শুনে হো-হো হাসিতে ফেটে পড়ল রিমিতা। মিন্টুরও চোখ মুখ চকচক করে ওঠে। রিমিতা বলল, 'এই ব্যাপার! তোর বাবা এত আপসেট! তোর বাবা ক্লাস এইটে বিয়ার খেয়ে বমি করেছিল, আর তুই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিস! তোর বাবা অবশ্য মারপিট করেনি। উফফ, এই নিয়ে ডিপ্রেসড হয়ে বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বাড়িতে গুম হয়ে বসে। না, না, আপনাকে এটা মানায় না। যা হবার হয়ে গেছে। আর্য ওর ভুল স্বীকার করেছে। ওকে ক্ষমা করে দিন। শরীর মন আর কিছু খারাপ করবেন না। আপনি খারাপ থাকলে আমরাও খারাপ থাকব।'

শকুন্তলা তার শূন্য চায়ের কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে চা খুঁজছিল। আর ভাবছিল, আর্য তার বাবাকে অপ্রস্তুত হওয়া থেকে বাঁচাতে এক রাশ মিথ্যে বলে গেল। আর ওরাও বসে বসে হাঁ করে শুনল। বিশ্বাস করল! ছেলে কি বাবার মতো অভিনয় শিখছে? শুধু সে-ই পারল না!

ঘরের দরজার ফ্রেম খালি। সেখানে আর আর্য নেই। কিন্তু অমিত্রসূদন তাকিয়ে আছে—সেখানে এক রাশ মিথ্যের সাদা ধোঁয়া তালগোল পাকাচ্ছে। অমিত্রসূদন দেখছিল, একজন আশ্চর্য অভিনেতাকে। কী সুন্দর একটা দৃশ্য সে বিশ্বাসযোগ্য করে দিয়ে গেল। আর্য কী মিথ্যে বলল? নাকি অভিনয় করল?

মিথ্যের সাদা ধোঁয়ায় এখন ঘরের ভেতর সবাই তাজা হয়ে উঠেছে।

এগারো

'আমি একটু বেরুচ্ছি।'

আর্য এসে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কথাটা ছুঁড়ে দিল। শকুন্তলা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অমিত্রসূদনের মুখ দেখে চুপ করে গেল। রিমিতা বলল, 'তাড়াতাড়ি আসিস, আমরা চলে যাব।'

'আমি মেট্রো স্টেশনের সামনেই আছি। তোমরা গেলে দেখা হয়ে যাবে।'

আর্য চলে যেতে আবার ওরা আড্ডায় ঢুকে পড়ল।

শকুন্তলা উঠে এল, ওর এত তত্ত্বের কচকচি ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে মনে হয় অমিত্রসূদনের দিনযাপনের সঙ্গে সে মিসফিট। যত দিন যাচ্ছে সে দূরত্ব যেন বেড়েই যাচ্ছে।

আচ্ছা, রিমিতা কি সেই দূরত্বের মাঝে এসে...

শকুন্তলার মাথার ভেতর দপ দপ করে। সে যেন টের পায় অমিত্রসূদনের কক্ষপথে তার ভূমিকা শুধুই গৃহকর্ত্রী, তার সন্তানের মা। আর কিছু নয়। তার সন্তানকে আঁকড়ে ধরেই বাদবাকি জীবন চলতে হবে। সে এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। আর্য কী দ্রুত বেরিয়ে গেছে, ওকে দেখতে পাওয়া গেল না। ছেলেটাকে নিয়ে বড্ড চিন্তা হয়। এত বোকা ছেলে, হাতে পায়েই বড় হয়েছে, বোধবুদ্ধি কিছু হয়নি। এটা হয়তো ওদেরই দোষ। একমাত্র সন্তান বলে সবসময় আগলে আগলে রাখার কুফল।

আর্য বাড়ির বাইরে এসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। তবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার নিজেকে কেমন কাটা ঘুড়ির মতো লাগল। কেন এমন লাগল? একটা সিগারেট ধরাল। মাথার ভেতরটা কেমন ভোঁ ভোঁ করছে। বাবা কি লালবাজারে শুনে আসা সব কথাগুলো মাকে বলবে? মা জানলে ব্যাপারটা বেশ চাপের হয়ে যাবে। সে জানে মায়ের কাছে সে একটি উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে! তার মা তাকে যতটা বিশ্বাস করে ততটাই যেন অবিশ্বাস করে।

সে কি অবিশ্বাসের কাজ করেছে? করেছে করেছে প্রচুর করেছে। মাকে দিনে পঞ্চাশটা মিথ্যে বলেছে, ব্যাগ থেকে টাকা সরিয়েছে। আর...

ঐন্দ্রিলাকে তার ভালো লাগত। না, সে প্রপোজ করেনি। ঐন্দ্রিলাও তার জন্য মেট্রো স্টেশনে এসে দাঁড়াত। দুজনে একসঙ্গে রিকশয় ফিরত। আর্য নিজের ভাড়াটা দিয়ে

বাদবাকি ওকে দিতে বলত। এটা এমন কিছু খারাপ নয়। কিন্তু মা দেখতে পেয়ে এত রিঅ্যাক্ট করল। পর পর দুদিন মেট্রো স্টেশনে এসে দাঁড়াল। চোখ মুখে এত রাগ—মাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল কিছু একটা হয়েছে। ঐন্দ্রিলা ওর মাকে পর পর দু'দিন দেখে অন্য রিকশয় উঠে চলে গিয়েছিল। ওর খুব খারাপ লেগেছে, সেটাই স্বাভাবিক। একদিন ওকে দেখতে পেয়ে আর্য এগিয়ে গিয়েছিল কথা বলতে, ও স্যরি বলে সরে গিয়েছিল। আর্য আর কোনওদিন ওর দিকে তাকায়নি। ঐন্দ্রিলা মাঝে মাঝে এই মেট্রো স্টেশনের সামনে এসে ঠেক মারে। ওকে দেখলে পরিচিতের হাসি হাসে, ব্যস।

মাঝে মাঝে আর্যর মনে হয়—তার বাবা নাটক করে, অনেক মানুষজনের সঙ্গে মেশে, কিন্তু তার বাবা একটা গণ্ডির ভেতর আটকে আছে। তার বাবা যখন মনে করে গণ্ডির বাইরে যাচ্ছে, বৃত্তের বাইরে এসে ভাবছে, তখনও আর্যর মনে হয়, তার বাবা গণ্ডিটার বাইরে যায়নি, গণ্ডিটারই সংকোচন প্রসারণের খেলাকেই তার বাবা বিপ্লব ভাবছে।

মাকে কোনও দোষ দেয় না আর্য। মাকে দেখলে তার মনে হয় একজন আদর্শ নারী। বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে। প্যাতপেতে বাংলা সিনেমার নায়িকাদের মতো। মায়ের সারাজীবনটাই যেন ব্রতকথা। এই করলে এই হবে, এই করলে ওই ফল মিলবে। গাড়ি ঘোড়া চড়বে। স্ট্যান্ডার্ড বজায় থাকবে। নীচের দিকে না ওপর দিকে তাকা, ওপরের দিকে।

ওপরের দিকে তাকাতে তাকাতে আমার ঘাড় যে ব্যথা হয়ে যাবে। নীচে দেখলেই মা ঘাড় সোজা করে দিচ্ছে। আবার ওপর দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গেলেই বলছে, বড্ড বড়লোকি শিখেছিস!

আর্য বুঝে পায় না—সে কী করবে? সে চিৎকার করে বলেছে, তোমাদের উচিত হয়নি, আমাকে ওই স্কুলে পড়ানো। পাড়ার স্কুলে পড়াতে পারতে। তাতে আমার ভালো হতো, আমাকে এই প্রবলেম ফেস করতে হতো না। পাড়ায় কিছু বন্ধু থাকত, তারা তোমার ঠিক করে দেওয়া স্ট্যান্ডার্ডের।

ওর মাথার ভেতর কাল রাত থেকে পর পর কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। ঘুরপাক খাচ্ছে, নাকি দারাসিংয়ের মতো গররর গররর করছে? আর অমিত্রসূদনের দিকে তাকালে ওর মনে হচ্ছে—ওর বাবাকে কেউ যেন গুঁতিয়েছে। অন্যসময় এ ধরনের প্রবলেমকে সে এনজয় করে। অন্য বন্ধুরা মাঝে মাঝেই বলে, তোর টেনশন হয় না? ঠোঁট বেঁকায় আর্য। তার কোনও কিছুতেই টেনশন হয় না। মনে হয়, ওক্কে। আর একটু এগিয়ে দেখি সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক তো হয়ে যায়—

ক'দিন আগে মনীষাকে দেখছিল, খুব বিধ্বস্ত। খালি খালি সিগারেট খাচ্ছে। একটা গাঁজা ভরা সিগারেট প্রায় পুরোটা মেরে দিল।

আর্য কোনও প্রশ্ন করেনি। একবার ভেবেছিল ওর বয়ফ্রেন্ড জিষ্ণুর সঙ্গে কি ব্রেকআপ হয়ে গেল? তাহলে শোক কাটিয়ে একটা ব্রেকআপ পার্টি দেওয়া উচিত। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, কেসটা আরও জন্ডিস। এমন গুম মেরে আছে। জিষ্ণু তো খুব ভালো ছেলে। সাত চড়েও রা কাড়ে না। মনীষার পোষা বেড়াল। তাহলে?

আর্য বলল, 'কী রে? এমন পাংচার হয়ে আছিস কেন?'

মনীষা বলল, 'চ পুকুরপাড়ে গিয়ে বসব।' বসতে হল না, তার আগেই মনীষা গড়গড় করে বলতে শুরু করল, 'এই জিষ্ণুকে কিছু বলবি না, মালটা ক্যালানে। এত সিরিয়াসলি সব কিছু নেয়, যে টেনশন হয়ে যায়।'

আর্য বলল, 'তুই তো নিজেই টেনশন করছিস।'

'না, না, টেনশনের কিছু না। তোকে তো আমার বাবার কথা আগেই বলেছি। লোকটার এত মেয়ের নেশা! মেয়ে দেখলেই হল—ফ্লার্ট করতে শুরু করল। সে বিয়েবাড়ি হোক কি শ্রাদ্ধবাড়ি। অফিসের পার্টি, ট্যুর এগুলো আমরা ধরি না। এসব নিয়ে দু-একবার ছোটখাটো ঝামেলাও হয়েছে। একবার আমাদের এক আত্মীয়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। তার হাসব্যান্ড আমার মাকে নালিশ করতে এসেছিল। মা পরিষ্কার বলল, আপনি দুজনকে ডাকুন, ডেকে জেনে নিন কতটা ডুবেছে। যদি তেমন হয় আপনি ডিভোর্স দিয়ে দিন। আমিও ওকে ডিভোর্স দিয়ে দেব। ওরা একসঙ্গে থাকুক। শুনে সেই মেসোমশাই আঁতকে উঠে বলল, না, না, আপনার হাসব্যান্ডের নেচার খুব খারাপ। আমার স্ত্রী আগে গল্প করেছে অন্য কোন এক দিদি বা বউদির সঙ্গে নাকি রিলেশন ছিল। এখন আমার মিসেসকে পাকড়েছে। মা বলল, ওকে বলুন ভালো ছেলে দেখে পরকীয়া করতে। এই লোকটার নামে আমার কাছে অনেক কমপ্লেন এসেছে। আমি একে শাসন করতে পারব না। পারলে, কি আমাকে ছেড়ে অন্যদিকে মুখ দিতে যায়! মা প্রথম প্রথম অনেক অশান্তি করেছিল, তারপর যা পারে করুক করে ছেড়ে দিয়েছে। শুধু নিজের বিছানাটা আলাদা করে নিয়েছে। বাবার সঙ্গে একদম শোয় না। এখন মায়ের পরিষ্কার থিওরি যা করছ করো, কিন্তু বাইরের জুতো ঘরে ঢোকার আগে খুলে ঢুকবে।'

আর্য হাসছিল, 'তাহলে তো মিটেই গেছে, তবে তুই গুম মেরে আছিস কেন?'

মনীষা একটু চুপ করে থাকল। বলল, ' না রে, আমার মায়ের একটা বয়ফ্রেন্ড জুটেছে। ছেলেটা কবিতা লেখে। কবি! মা সারাদিন তাকে নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে। ছেলেটা মাকে নিয়ে কীসব প্রেমের কবিতা লিখছে। লিখে লিখে পাঠাচ্ছে। কোথাও কোথাও ছাপাও হচ্ছে। সে সব পত্রিকাগুলোও এখন আমাদের বাড়িতে আসছে। সম্পূর্ণ বায়বীয় প্রেম, প্লেটোনিক লাভ, এর ঘোর মারাত্মক! আমি কাল সরাসরি মাকে বললাম, তোমার কী ব্যাপার, ঝেড়ে কাশো। সিরিয়াসলি, মা আমাকে যা বলল, তাতে মনে হল সত্যি সত্যি প্রেমে পড়েছে। মায়ের সব কথা শুনে আমি জানিস তো খুব ইনসিকিওর্ড ফিল করছি। আমি মাকে বোঝালাম, এসব কবি টবি মালগুলোকে চেনো না। ওগুলো সব ঢপ! ওদের পাল্লায় পড়ো না। মা বলল, ছেলেটা খুব ভালো। শুধু ফোন করে। কখনও দেখা করতে চায় না, বা কোনও বদ মতলবও নেই, শুধু কথা বলতে চায়। ওর কথার নেশা।'

'তাহলে প্রবলেমটা কোথায়?'

মনীষা খিঁচিয়ে উঠল, 'ওই কবির কথার নেশায় আমার মা যে প্রেমের নেশায় পড়েছে। কী করে কেসটা সামলাব বুঝে উঠতে পারছি না! পুরো হাওয়া হাওয়া লাগছে। ফাঁপা!'

কাল থেকে আর্যরও নিজেকে ফাঁপা লাগছে। যেন মনে হচ্ছে সে হাওয়ায় ভরে গেছে। স্রেফ হাওয়া! সামলাতে পারছে না।

সোহমকে ফোন করল। সোহম বলল, 'তুই আয় আমি যাচ্ছি।'

মেট্রো স্টেশনের সামনে দেখল আরও তিনচারজন বন্ধু। এখানে আর্য কিছুটা আউটসাইডার। এরা সবাই এক স্কুলের স্টুডেন্ট, অথবা মোটামুটি এই এলাকার কোনও না কোনও স্কুল বা কোচিং ক্লাসের। আর্যর স্কুল ছিল পার্ক স্ট্রিটে। ও এদের সঙ্গে নিজেকে ঠিক মেলাতে পারে না। সোহম ওর কলেজের বন্ধু। সোহম না থাকলে এখানে এই আড্ডা তার কাছে আনকমফর্টেবল।

গিয়ে দেখল সোহম চলে এসেছে। একটু দূরে উজ্জয়িনী কাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সোহম বলল, 'উজ্জার বয়ফ্রেন্ডটা ডিচ করেছে, খুব কান্নাকাটি করছে।'

'ওর সঙ্গে কে?'

'ওকে তুই চিনবি না, ও ঋভু। সারা স্কুল-টাইমটা উজ্জা এর সঙ্গেই প্রেম করে এসেছে। কলেজে গিয়েই একে কাটিয়ে দিয়ে গাড়িতে উঠেছিল। এখন একে ডেকে নিয়ে এসে কান্নাকাটি করছে। আর ও উজ্জাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। সিগারেট দে।'

'নেই, কিনতে হবে।'

আর্য টাকা বের করল। রাস্তা পার হয়ে ওদিকের দোকানে গেল। বলল, 'ওই লোকটাকে আবার দেখলাম।'

'কোন লোকটা?' সিগারেট ধরিয়ে সোহম বলল।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে আর্য বলল, 'ওই ব্রোকারটা, হাতে ডায়েরি নিয়ে সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে।'

ধোঁয়া ছেড়ে সোহম বলল, 'আবার আসছে এদিকে। সন্টুদাকে খবরটা দিতে হবে। এবার ওকে মারবে।'

'ও যখন এখানে আসছে, ওর ক্লায়েন্টও নিশ্চয়ই কিছু আছে।'

'আছে নিশ্চয়ই। তাদেরই ডায়েরি দেখিয়ে পছন্দ করায়। সন্টুদা আগের বার হাতের ডায়েরি কেড়ে নিয়েছিল। ডায়েরি ভর্তি শুধু মেয়েদের ছবি। বলে কি না প্রডিউসারদের অ্যাকট্রেস সাপ্লাই করি। সব উঠতি অ্যাকট্রেস। আসলে মালটা মেয়েদের দালাল! সব সিনেমা টিভিতে অ্যাক্টিং করতে আসে, তাদেরই টাকার লোভ দেখিয়ে টেনে নিয়ে আসে।'

সোহম বলল, 'তুই দাঁড়া, আমি মালটাকে নিজের চোখে দেখে আসি।'

সোহম লাফিয়ে চলে গেল। আর্যর ধারেকাছে আরও দু-চারজন দাঁড়িয়ে। আর্যর কাছে প্রাজ্ঞ এগিয়ে এল, বলল, 'সোহম কি চলে গেল?'

'না, আসছে, ওদিকে সিগারেটের দোকানে গেছে।'

বলতে বলতে সোহম ফিরে এল, ওর চোখ মুখ লাল। বলল, 'ঠিক দেখেছিস, এখন এটিএম-এর সামনে দাঁড়িয়ে একটা বুড়োর সঙ্গে কথা বলছে। আমাকে দেখতে পায়নি। আমি ওর ব্যবস্থা করব।'

প্রাজ্ঞ বলল, 'এই সোহম, শুনলাম রিহ্যাব থেকে দিব্য ফিরে এসেছে। ওর ছোটমামা এসে খবর দিল। বলল, বন্ধুদের বোলো, ওর সঙ্গে দেখা করতে। আমার মনে হয়, আমাদের টোটাল গ্রুপটার ওর কাছে যাওয়া উচিত।'

সোহম বলল, 'ওর পুলিশ কেস উঠে গেছে?'

'সে তো অনেকদিন আগে, ওর দাদু মামারাই মিটিয়ে নিয়েছে। ও কি আর সুস্থ মস্তিষ্কে ওর দাদুর বাড়ি ডাকাতি করতে গিয়েছিল, নেশার ঝোঁকে ট্র্যাপে পড়ে গিয়েছিল। ওর দাদু তো জানতে পেরেই ক্ষমা করে দিয়েছে, মামারা ফুল সাপোর্ট দিচ্ছে, আমাদেরও একটু এগিয়ে যাওয়া উচিত। একসঙ্গে পড়েছি, ও খারাপ ছেলে নয়। আর যেটুকু খারাপ কাজ

করেছে, তারজন্যে ও শাস্তি পেয়েছে। আমি ডিসিশন নিয়েছি, পারসোনালি আমি তো যাবই, আর চাই সবাই তোরা আমার সঙ্গে চল।'

সোহম কেমন দ্বিধান্বিত মুখে আর্যর দিকে তাকিয়ে থাকল, বলল, 'নেশা টেশা ফ্যাক্টর নয়, কিন্তু ডাকাতির কেস ওর ওপর ছিল। আমরা আবার জড়িয়ে পড়ব না তো?'

'কেন জড়াবো? আমরা ওর পুরনো বন্ধু, স্কুলের বন্ধু, আমরা গেলে ওর যেটুকু প্রবলেম ছিল তা ও কাটিয়ে উঠতে পারবে। আমরা ওর সোস্যাল জায়গাটা ক্লিন করে দিতে পারব না, কিন্তু আমরা সব ভুলে ওকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি।'

আর্য বলল, 'আমি দিব্যকে চিনি না, কিন্তু আমি যেতে পারি।'

'গ্রেট!' প্রাজ্ঞ বলল। 'ও খুব জমাটি ছেলে, দুরন্ত গান গায়। ওর গান শুনলে ফিদা হয়ে যাবি।'

ওদিক থেকে চিনু চিৎকার করে জানতে চাইল, 'সোহম যাবে?'

সোহম উত্তর দিল না। প্রাজ্ঞ বলল, 'হ্যাঁ, আর্যও যাবে।'

চিনু বলল, 'কাল সন্ধেবেলা চল, আমিও যাব, বরং গ্রুপে দিয়ে দে, কাল সিক্স থার্টি।'

'না, সিক্স থার্টি হবে না। সাত কর।' প্রাজ্ঞ বলল।

আর্য বলল, 'কাল তাহলে আমি চলে আসছি, দিব্যর গান শুনতে হবে।'

সোহম মুখ বিকৃতি করল, 'গান গাইত আগে, সত্যিই ফাটাফাটি গাইত, কিন্তু গাঁজা টেনে টেনে ওর সব দম শেষ। এখন গান গাইতে গেলে ওর গলার শিরা ফুলে ওঠে, হ্যা হ্যা করে শ্বাস নেয়। গান আর হবে না।'

প্রাজ্ঞ বলল, 'কেন হবে না, নিশ্চয়ই গান হবে, আমি গিটারটা নিয়ে আসব। ও ঠিক গাইবে, মনের জোরে গাইবে। যেখানে পারবে না, সেখানে আমরা ম্যানেজ করে দেব।'

বারো

শনিবার সকালে অমিত্রসূদন বলল, 'কী কথা বলবি—একটু ভেবে নিয়েছিস?' কথাটা শুনেই ভ্রু কোঁচকাল আর্যনীল, 'কী ভাবব?'

অমিত্রসূদন একটু চুপ করে থাকল, গত তিন-চারদিন ধরে তার ভেতরে কী হচ্ছে কেউ জানে না। বিষয়টা নিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলা যায় না। কিন্তু কাউকে কাউকে বলতেই হয়। যদি বিপদ-আপদ কিছু ঘটে। কিন্তু যার সঙ্গেই সে কথা বলছে, সেখানে সে শতাংশ মেপে কথা বলছে। এমনকী, শকুন্তলার সঙ্গেও। গত দুদিনে টুকরো টুকরো অসংখ্য কথার মাঝে সে আর্যনীলের যাবতীয় নেশা করার একটি কথাও বলেনি। কেন বলেনি? তার কারণ শুধু আর্য নয়, শকুন্তলাও। বার বার তার মনে হয়েছে, একটু এদিক ওদিক হলেই শকুন্তলা আক্ষেপ করে, সে বাড়ি থেকে কী করল? সে ভালো মা হতে পারল না, তার কী অপরাধ? কোথায় তার খামতি? এত চেষ্টা করেও কেন সে ছেলের বন্ধু হতে পারল না? সে তো চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। স্কুলে নিয়ে গেছে, নিয়ে এসেছে। বিকেল হলে পার্ক, খেলার মাঠ, আঁকার স্কুল, যখন আর্যর যা মনে হয়েছে তাতেই সঙ্গী হয়েছে। কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি দুটো টাইমই সে দিয়েছে। তবে?

শকুন্তলা প্রায় বন্ধু-বান্ধবহীন জীবন কাটায়। যাওয়া বলতে বছরে একবার দুবার করে বাইরে বেড়াতে যাওয়া। অমিত্রসূদনের নতুন নাটক, সারা বছরে ক'টা ভালো সিনেমা, পুজোর সময় বেশ কয়েকবার মার্কেটিং, এর মধ্যেই তার জীবন সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল। তবে তার কেন এমন হল? আর্যর সঙ্গে কথা বলা যায় না, সবসময়ই কেমন একটা রুক্ষভাব। কথা বলতে গেলেই দূর দূর করে। ওর ঘরে ঢুকতে গেলে যেন পাসপোর্ট লাগবে। কাজের বউটি এসে দাঁড়িয়ে থাকে, আর্যর মেজাজের জন্য সে দরজা ঠেলতে সাহস পায় না। শকুন্তলাকে যেতে হয়। কাজের বউটির সামনে নিত্যদিন তাকে ঘরে ঢোকার অনুমতি নিতে হয়।

যেদিন আর্য একটু সকাল সকাল বেরিয়ে যায়, সেদিন আর শকুন্তলা কাজের বউটির জন্য অপেক্ষা করে না। ঝাঁটা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ঘরে। শকুন্তলার ভয় হয়। তার মনে হয়, কাজের বউটি যদি আর্যনীলকে নিয়ে বাইরে গিয়ে কোনও খারাপ কথা বলে, কোনও বিরূপ মন্তব্য করে। অহেতুক, অকারণে কেন এত রেগে যায় আর্য, যে শকুন্তলা বুঝে উঠতে পারে না? শকুন্তলা একদিন ওকে জিগ্যেস করেছিল, 'এত রেগে যাস কেন?'

আর্যনীল চটজলদি জবাব দিয়েছিল, 'আমার রাগ আছে বলে টিকে আছি। নইলে কবেই ফুস হয়ে যেতাম।'

'কই তোর বাবা তো রাগে না?'

'বাবাকে একটু রাগতে বলো, অনেক কিছু পাবে। বাবার স্বভাবই হচ্ছে গিয়ে পিছনের চেয়ারে বসা। আর বাবার লাইনের দু'দিনের যোগীদের দেখছ, কেমন সামনে গিয়ে পা তুলে বসে, ঠ্যা*ং নাড়ায়।'

'একদম বাজে কথা বলবি না।' শকুন্তলা ছেলের ভাষা শুনে বিরক্ত হয়।

আর্য হাসে, 'বাবার থিওরি হচ্ছে মাটির কাছাকাছি থাকো। কিন্তু আমি দেখছি, বাবা মাটির কাছাকাছি থাকতে গিয়ে ডেবে গেছে—এখন বাবাকে মাটি থেকে তুলতে হলে ক্রেন লাগবে।'

'আর্য ভালোভাবে ভদ্রভাবে কথা বল।' এবার সে গর্জে ওঠে।

আর্য হাসে। 'আমি ভালো কথা বলছি মা, ক'দিন আগে বাবাদের গ্রুপের সৌমেনকাকু নাটকের শো বাদ দিয়ে সিরিয়ালের কাজে গিয়েছিল। বিষয়টা নিয়ে বেশ একটা সমস্যা হয়েছিল, তুমি জানো। সেদিন রমাপতিজ্যেঠু কী বলেছিল বাবাকে—অমিত্র মুখ খোল, মুখ খোল, এত নীচু হলে এরপর তোর গায়ে কুত্তায় পেচ্ছাব করে যাবে।'

শকুন্তলা আর সহ্য করতে পারল না, ঠাস করে একটা চড় মারল আর্যর গালে। চড় খেয়ে আর্য হাসে, 'উঃ কতদিন পরে তোমার মার খেলাম। এখনও তোমার হাতটা আগের মতোই নরম আছে।'

হঠাৎ কথা থামিয়ে মিটমিট করে হাসে আর্য, 'অথচ দেখো মা, তবু তোমার কনফিডেন্স কী ভীষণ কম। নাহলে তুমি নাটকের ওই মেয়েগুলোকে নিয়ে বাবাকে কথা শোনাও? একদিন রিমিতাদিকে নিয়ে তো খেতে বসে আমার সামনেই কত কথা বললে, আমি তোমাকে সেদিন কী বলেছিলাম—বাবা বড্ড ভীতু। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। খাঁচার বাইরে যাবে না। আজ তোমাকে বলি, বাবার মতো ভীতু হলে আমি এই সময়ে টিকতে পারব না। বাইরের দুনিয়াটা তুমি জানো না। সবাই সবাইকে টিপে মেরে দিতে চায়। হিউজ

কমপিটিশন। কেউ কারও বন্ধু নয়। এটা কারো দোষ নয়, এটাই আমাদের সময়। আমরা কারো ক্ষতি চাই না কিন্তু অন্যদের থেকে এগিয়ে যেতে চাই।'

'তুই এই কথা বলছিস কই আর কেউ তো এমন কথা বলে না?'

'বলে বলে, সবাই বলে—তোমরা জানতে পারো না। আমি তোমাকে বলব, ওয়ান টু থ্রি ফোর করে বলো, আমি তোমাকে বলি—কার কথা শুনতে চাও বলো?'

শকুন্তলা সেদিন চুপ করেছিল। সে কারও কথা শুনতে চায়? না, সে কারও কথা শুনতে চায় না। সে তো দেখেছে, আর্যদের স্কুলের ভালো ভালো ছেলেগুলো কীভাবে গোল্লায় চলে গেছে। তাদের মা-রাও কোয়ালিটি টাইম দিত। এই তো কিছুদিন আগে দীপশিখার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কী অবস্থা ওর! ওকে দেখে হাত ধরে রাস্তার ধারে টেনে নিয়ে গেল। ওর ছেলে আর্যর থেকে দু-ক্লাস উঁচুতে পড়ত। খুব ভালো স্টুডেন্ট। আইসিএসইতে দুর্দান্ত রেজাল্ট করল, তারপরই ছেলেটা গোল্লায় চলে গেল। সারাদিন নেশা আর নেশা। মাঝে দু-দুবার রিহ্যাবে পাঠাল। সারা ঘরে নাকি হেরোইনের রাংতা উড়ত। রাংতা দেখে আগে বুঝতে পারেনি। অনেক অনেক পোড়া দেশলাই কাঠি দেখে বুঝতে পারেনি। অবাঞ্ছিত ছাই দেখে বুঝতে পারেনি। শকুন্তলাকে কত সাবধান করল। বলল, দ্বৈপায়ন ফিরে এসে ক'দিন ঠিক ছিল। এখন আবার যেই কে সেই। ক্রমশ দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

শকুন্তলা বাড়ি এসে অমিত্রসূদনকে দ্বৈপায়নের রিহ্যাবে যাওয়া এবং ফিরে এসে আবার নেশা করার কথা বলেছিল। অমিত্রসূদন সেদিন ভালো করে কোনও কথা শুনতে চায়নি। বলেছিল, সবসময় সর্বকালেই দু-একজন জীবনের মূল স্রোত থেকে ছিটকে যাবে। এটাই নিয়ম। তীব্র আপত্তি করেছিল শকুন্তলা। কেন? কেন হবে এমন? সে মানতে পারেনি। দীপশিখা আর ওর হাসব্যান্ডকে ব্যক্তিগতভাবে শকুন্তলা চেনে। দু'জনেই খুব ভালোমানুষ। সাংসারিক কোনও সমস্যা নেই। হ্যাপি ফ্যামেলি। তাহলে? শকুন্তলা খবরের কাগজের নিবন্ধ পড়ে, টিভি দেখে, ইন্টারনেট সার্চ করে, তার মতো করে বুঝতে চেষ্টা করে—বয়ঃসন্ধিক্ষণের সমস্যা। অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড! যৌথ পরিবারের ভাঙন। এক সন্তান…।

অমিত্রসূদন বলেছিল, হাতছানি! সারা পৃথিবীটা কেমন পালটে যাচ্ছে দেখছ না। ভোগবাদের এক ভয়ঙ্কর চোরাস্রোত, এই স্রোতে কেউ না কেউ তো ভেসে যাবেই। কাউকে না কাউকে তো বলি হতেই হবে। শকুন্তলা বোঝে—আজ নিজের ঘরে আগুন লেগেছে। সত্যিই কি আগুন লেগেছে?

শকুন্তলাকে আর্যনীল খুব গম্ভীর স্বরে বলল, এগুলো সব সময়ের চিহ্ন। ট্যাটু! ট্যাটু দেখেছ? কেউ ড্রাগন আঁকে, কেউ প্রজাপতি! এগুলো হচ্ছে টাইমের ট্যাটু। তোমরা টাইমটাকে রিড করতে পারছ না। তাই এত উতলা হচ্ছ। দ্বৈপায়নদা টাইম মেশিনে উঠেছিল, পা পিছলে পড়ে গেছে, চোট পেয়েছে, ও আলাদা কিছু না। হতে পারে হোল লাইফের জন্য ওর স্পাইনাল কর্ড চোকড হয়ে গেল। বা আবার দেখবে, দ্বৈপায়নদা সামলে নিয়ে মেশিনে সেট করে গেছে। কী হবে বড়জোর যেখানে যাওয়ার কথা ছিল সেখানে যাবে না। ভিন্ন কোনও রাস্তা নেবে। আর যদি মেশিনের চাকায় জড়িয়ে যায়, মরে যাবে। ফিনিশড। মা, বাইরের পৃথিবীটা এখন একদম অন্যরকম। কেউ ওয়াকওভার দেয় না। কেউ দান ছেড়ে চলে যাবে না। সবাই সবার মতো করে যুদ্ধ করছে। এ এক অন্য যুদ্ধ। তোমাদের সময় কী ছিল? পড়াশোনা করো। তারপর চাকরি। তারপর বিয়ে। তারপর এটসেটরা এটসেটরা…।

আমি তোমাকে ওয়ান টু থ্রি করে শুধু সময়টা দেখাই—

শওকতজ্যেঠুর ছেলে। ঈশান। ওর বাবা কবি। বুদ্ধিজীবী। ছেলে নাম রেখেছিলেন — ঈশান। ওরা মুসলিম। ও আমাদের মতো মিক্সড কালচারের স্কুলে পড়লে খাপে খাপ হারামির বাপ হয়ে যেত। কিন্তু ও যে স্কুলে পড়ে সেখানে ওর মতো মুসলিম ছেলে নেই বললেই চলে। যারা আছে, তারা ধর্মের মতো নামেও মুসলিম। আকবর কিংবা ঔরঙ্গজেব। ওদের কিন্তু কোনও অসুবিধেই নেই। অসুবিধে ঈশানের—কেউ একজন আবিষ্কার করে ঈশান হল শিবের নাম। তাহলে শিবের নাম কেন একটা মুসলিম ছেলে রাখবে? ওর নাম হওয়া উচিত এহসান কিংবা ওসমান। ব্যস কিছু ছেলে ওর পিছনে পড়ে গেছে। খুব ডিসটার্ব করছে। শওকত জ্যেঠু দু-দুবার স্কুলে গেছে, কিন্তু প্রবলেম সলভ করতে পারেনি।

তুমি আমাকে বলো ঈশান কার সঙ্গে লড়ছে? নিজের নামের সঙ্গে? বাবার সর্বধর্ম-সমন্বয়ের সঙ্গে? নাকি ধর্ম ধর্ম খেলার সঙ্গে?

নাম্বার টু—তুমি দিয়া দিদির কথা বলো। ভালো মেয়ে। খুব ভালো মেয়ে। পড়াশোনায় ভালো। জেএনইউ'র মেয়ে। গেট পেয়েছে। দিয়া দিদির ইচ্ছে ছিল দেশভাগ হওয়ার পর যে ছিন্নমূল মানুষরা কলোনি বানিয়েছিল, তারা এখন কী অবস্থায় আছে এই নিয়ে কাজ করবে? ভাবনা ছিল রেঞ্জ হবে যাদবপুরের রিফিউজি কলোনি থেকে আন্দামান। দিয়া দিদির স্বপ্ন ছিল প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মার্জিনাল ম্যান-এর মতো একটা কাজ করবে। দিয়াদিদি পারল না। ইউনিভার্সিটিগুলোর দরজায় দরজায় ঘুরল। কেউ ওর বিষয়টায় রাজি হল না, অথচ দেখো, অস্ট্রেলিয়ার একটা ইউনিভার্সিটি ওর ভাবনা শুনে সাদরে রিসার্চ করার সুযোগ করে দিয়েছে। ও ওখানে মাইগ্রেট করা মানুষজনের ওপর কাজ করছে। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার ওপর তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। দিয়া দিদি কিন্তু কোনও অবস্থায় মেনে নেয়নি। ওর খুব রাগ! দিয়াদিদি কিন্তু নিজের ভাবনার সঙ্গে লড়ছে। আশ্চর্য না!

নম্বর থ্রি—অনুপ্রভাদি। খুব ভালো মেয়ে। শান্তশিষ্ট, ভদ্র। তোমার কাছে ভালোমেয়ের যা সংজ্ঞা অনুদি তাই। জার্মানির এক ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গেছে। শেয়ার করে ওই ইউনিভার্সিটির তিনজনের সঙ্গে থাকে। ওরা তিনজন মেয়ে আর একটি ছেলে। ছেলেটা আবার গে। ওদের অ্যাপার্টমেন্টটায় তিনটে রুম। আর একটা লিভিং স্পেস। ওখানে সবার প্রচণ্ড ব্যক্তিস্বাধীনতা। প্রাইভেসি। কেউ কারও জীবনে উঁকি মারে না। কিন্তু অনুপ্রভাদির বাঙালি মধ্যবিত্ত স্বভাব। সে এখন বই আর কম্পিউটারে মুখ দিয়ে সবার ঘরে কান দিয়ে বসে আছে। মেয়েগুলো নাকি কথায় কথায় বয়ফ্রেন্ড পালটায়। আর গে ছেলেটি রোজ তার ঘরে বয়ফ্রেন্ড নিয়ে আসে। অনুপ্রভাদির সমস্যা কোথায়? অনুদি না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে বসে আছে। ও বয়ফ্রেন্ড জোটাতে পারছে না। কারণ, ও বুঝে গেছে ওখানে বয়ফ্রেন্ড হয়, পালটে যাওয়ার জন্য। চিরস্থায়ী নয়। অগত্যা ও আপাতত তিন নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে গেছে। সেটাও চেঞ্জ করবে। অনুদি একটা অদ্ভুত যুদ্ধ করছে, নিজের সঙ্গে। নিজের বিশ্বাস, ইডিওলজির সঙ্গে।

মা এখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে এটা কম বড় যুদ্ধ নয়। মহাভারতে ছিল নিজের জ্ঞাতিগুষ্টি, এখানে নিজের বিশ্বাস চিন্তা ভাবনা নাম জাত সব জড়িয়ে গেছে! যারা পড়তে চাইছে, তাদের কাছে নম্বর নেই। যাদের নম্বর আছে, তাদের কাছে টাকা নেই। তার মানে কি দাঁড়াল মেরিট চাই, টাকা চাই।

শকুন্তলার মনে হচ্ছিল, সে কি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, আজ সঞ্জয় হয়ে তাকে অন্য এক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ শোনাচ্ছে আর্যনীল? তারই সন্তান!

তেরো

সৌম্যশংকর লাহিড়ী। নামকরা ক্রিমিনাল ল'ইয়ার। তার দু-চোখ বন্ধ। এক মনে অমিত্রসূদনের কথা শুনছিলেন। সেই সন্ধেবেলা অমিত্রসূদনদের বাড়ির সামনে আসা পুলিশের গাড়ি থেকে লালবাজারে যাওয়া পর্যন্ত। সব শুনে উনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। বললেন, 'আপনি খুব ভুল করেছেন অমিত্রসূদনবাবু। ওদের কাছে কোনও সার্চ ওয়ারেন্ট নেই। আর আপনি নির্দ্বিধায় ওদের বাড়িতে ঢুকতে দিলেন। যাই হোক, করে ফেলেছেন। ভবিষ্যতে এমন রিস্ক নেবেন না।'

'আমি ওদের বিশ্বাস করেছি। ওরা আমাদের ভালোই চায়।'

'থাকুন, আপনি আপনার বিশ্বাস নিয়ে। তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন?'

'সুপ্রভাত নিয়ে এল, বলল...।'

অমিত্রসূদনের পাশে বসা সুপ্রভাত লাফিয়ে উঠল, 'সৌম্য আমি ওনাকে জোর করে নিয়ে এসেছি। ওকে আর নার্ভাস করে দিস না। তুই ওর কাছ থেকে ডিটেলসে সব শুনেছিস। তোকে আমি ফোনেই বলতে চেয়েছিলাম, তুই বললি চেম্বারে আয়। তাই এসেছি। তুই ওর পরিচয় জানিস না। ও খুব সম্মানীয় মানুষ। তুই আমার সঙ্গে কথা বল, পুলিশ কি আর্যকে ফাঁসাতে পারে? এক্ষেত্রে আইন কী বলছে?'

'ফাঁসাতেই পারে।' বন্ধ চোখে সৌম্যশংকরের উত্তর।

'ও তো জিনিসটা নিয়ে আসেনি।'

'মনে করে দেখ প্রথম কনসাইনমেন্টটা আর্যর কাছে এসেছিল, আর্য সেটা হজম করেছে।'

'সেটা কমোডে ফেলে ফ্ল্যাশ করে দেওয়া হয়েছে।' অমিত্রসূদন বলল।

'আপনার কাছে প্রমাণ আছে কমোডে ফেলার? মনে রাখবেন, পুলিশ কনসাইনমেন্টটা ইচ্ছে করে ছেড়েছে। দেখতে চেয়েছে পার্টি ওটা নিয়ে কী করে? পার্টি ওটা বিক্রি করেনি। ওদের কাছে বিক্রি করার কোনও প্রমাণ নেই। তাহলে দাঁড়াল কী? পার্টি ওটা কনজিউম করেছে।'

'না, না, এটা ঠিক নয়।' অমিত্রসূদন ঘন ঘন মাথা নাড়াল।

'সেটা আপনি বলছেন, কোর্ট শুনবে না। শুনুন স্যার, আমাদের সবার কাছে তার নিজের সন্তান হিরের টুকরো।'

অমিত্রসূদনের মুখে রক্ত জমে। মানুষটা কি অভদ্রের মতো কথা বলছে। সে তো বলেনি, তার ছেলে নির্দোষ। সে শুধু ঘটনাটি কী হয়েছে সে কথাই বলেছে।

সুপ্রভাত বলল, 'নেক্সট। তারপর বল? কী হতে পারে?'

'আপনার ছেলের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলেছেন? ছেলে কী বলছে?'

'ও এসবের বিন্দু-বিসর্গ জানে না।'

সৌম্যশংকর মুখটা ছুঁচোর মতো সরু করলেন। বললেন, 'ও তাই বলেছে? আপনি এটা বিশ্বাস করেন? আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না। আপনি সম্মানীয় ব্যক্তি, নাটক ফাটক করেন, নাম আছে। তাই পুলিশ আপনার ছেলেকে মোলায়েমভাবে জিগ্যেস করেছে। আপনি যদি

প্রোমোটার হতেন, তাহলে উলটো হতো। আপনার ছেলেকে আগে লকআপে ঢোকাত। বাপ আর ছেলেকে ভয় দেখিয়ে বলিয়ে নিত ও নিয়ে এসেছে। তারপর আপনার কাছ থেকে দু-চার লাখ টাকা নিয়ে গল্প করত। আর গরিব ঘরের ছেলে হলে প্রথমেই দু-চারটে থাবড়া, তারপর ডাণ্ডা দিয়ে লকআপ করে দিত। প্রয়োজন পড়লে আরও দু-চারটে কেস দিয়ে দিত।'

সুপ্রভাত বলল, 'কী হলে কী হতো তা বলে লাভ নেই। এবার কী করব সেটা বল?'

'ছেলের সঙ্গে ভালো করে কথা বলুন। ওকে সাহস জোগান। বলুন, সত্যি কথা বল তাহলে সেভ করা যাবে। মিথ্যে বললে আজ না হোক কাল পুলিশ ঠিক তুলে নেবে। ওরা দেখলেই বুঝতে পারে কে গিল্টি? ওদের কাছে কিন্তু পিকচার ক্লিয়ার, হয়তো খেলাচ্ছে। আপনি নামী মানুষ। তাড়াতাড়ি করলে হইচই হবে। এখন ফেসবুক, মিডিয়ার যুগ। পুলিশ মানেই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই ওরা আটঘাট বেঁধে এগুচ্ছে। শুনুন, বাড়ি গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলুন। ওকে দিয়ে স্বীকার করান। পুলিশ স্বীকার করানোর আগে ও আপনার কাছে স্বীকার করুক।' কথাটা বলে সৌম্যশংকর একটা ফাইল টেনে কয়েক মিনিট মগ্ন হয়। তারপর বলেন, 'শুনুন, ও যদি নিজে কনজিউম করে থাকে তাহলে ও বেঁচে গেল। যদি একটা টুকরোও বিক্রি করে থাকে, আর তার কোনও প্রমাণ থাকে, তাহলে ফাঁসবে। নারকোটিক্স ল বহুত কড়া। কিচ্ছু শুনতে চায় না। দেখেন না, রাজনৈতিক নেতারা অন্য দলের লোকদের গাঁজা কেস দিয়ে তুলে দেবার ভয় দেখায়। মার্ডার, অ্যাটেমপ্ট টু মার্ডার নয়, গাঁজা কেস মারাত্মক।'

'তাহলে তুই কী বলছিস? কী করব আমরা?' সুপ্রভাত বলল।

'কাল ডেকেছে যাক। ওখানে যেতে হবে। দেখুন ওরা কী বলে। তার আগে বার বার বলছি, ছেলের সঙ্গে কথা বলুন। আজকালকার ছেলে। ওরা বাপ মাকে হাটে কিনে মলে বিক্রি করে আসে। পারলে বিক্রি করে কমিশন কাটমানিও খেয়ে নেবে। সহজে ওদের বিশ্বাস করবেন না। আপনারা সব এই জেনারেশনের সঙ্গে মেশেন না, জানেন না। ইয়াং জেনারেশনটা পচে গেছে। বাইরে রঙচটা ছেঁড়া ফাটা জিনস দিয়ে যা সাজানো দেখছেন, ভেতরটা তার থেকেও বেশি ছেঁড়া ফাটা, রঙচটা। ওরা শুধু জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে চায়, স্বপ্ন।

ক্যালাইডোস্কোপ দেখেছেন? এলএসডি নিলে ক্যালাইডোস্কোপে যেমন একটা ছবি অনেকগুলো আয়নায় বার বার ধাক্কা খেয়ে নতুন নকশা, চোখ ধাঁধানো ছবি তৈরি করে, সাইকোডেলিক ড্রাগ এলএসডি তেমনি। ভুলভুলাইয়া! জানেন তো এলএসডিকে অনেকে ভুলভুলাইয়া বলে ডাকে। গোলোকধাঁধা, আপনার চেনা বাস্তবকে ভুলিয়ে নতুন দুনিয়া দেখাবে, পরাবাস্তব বলতে পারেন। এমন কিছু দেখতে পাবেন বা শুনতে পাবেন যা বাস্তবে নেই। এই হল মোদ্দা কথা। চোখ খোলা রেখে আপনি অন্য জগতে, চোখ বন্ধ করলে রঙের স্রোতে ভাসছেন। অতিপ্রাকৃত জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ম্যাজিক মাশরুম জানেন, শ্রুম? সিলোসাইবিন। এটা এক রকম ছত্রাক। এগুলো সব আধ্যত্মিক জগতের মানুষজনরা খায়। খেলে তাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি গাঢ় হয়। প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যায়, কানেক্ট করতে পারে। যে কোনও জীবিত বস্তুর সঙ্গে নাকি তাদের মিলন ঘটে যায়। মনে তখন বাঁধভাঙা আনন্দ। উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতে পারে। এই ম্যাজিক মাশরুম মনের সঙ্গে সংযোগ ঘটায়। কিছুদিন আগে আমি এলএসডি নিয়ে ধরা পড়া একটা ছেলের কেস করেছিলাম। কেসটা লড়ার জন্য তখনই আমাকে পড়াশোনা করতে হয়েছিল।'

সৌম্যশংকর লাহিড়ী থামেন। জল খান। বলেন, ‘কাল গেলে হাওয়া বুঝতে পারবেন। যদি দেখেন, দুম ধাড়াক্কা ওকে লকআপ করে দিচ্ছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করবেন। আপনি আপনার নাম, ছেলের নাম সব লিখে রেখে যান। দেখি কী করতে পারি?’

‘তুই আগে একটু কারো সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারিস তো?’ সুপ্রভাত বলল।

‘আরে আগ বাড়িয়ে কারও সঙ্গে আমি সেটআপ করতে চাইছি না।’

‘সেটআপ কেন জাস্ট একটু কথা আগে থেকে বলে রাখলি। প্রয়োজনে তখন যেন তাকে ঝটপট পাওয়া যায়, আগে থেকে বলে না রাখলে সে তো আকাশ থেকে পড়বে।’ সুপ্রভাত বলল। ‘তুই একটু কথা বল, আমার সামনেই বল। না-হলে তুই ভুলে খেয়ে নিবি। তখন দরকারের সময় তোকেও পাব না, ওনাকেও পাব না।’

সৌম্যশংকর মুখটা আবার ছুঁচোর মতো করলেন। মোবাইলটা নিয়ে দু-চারবার গলার স্বর মোলায়েম করে ফোন করলেন।

‘স্যার, কোথায় আছেন, ক্লাবে নাকি?...আপনি তো আমাকে ডাকছেনও না, আসছেনও না...।...একটা দরকারে ফোন করলাম। একজন খুব নামী লোকের ছেলেকে নারকোটিক্স ডিসটার্ব করছে। হ্যাঁ...ছেলেটার নামে নাকি হল্যান্ড থেকে ড্রাগ আসছে। কেমিক্যাল ড্রাগ। কেউ পাঠাচ্ছে বদমাইসি করে। দু-দুবার এসেছে চার পিস করে ট্যাবলেট। প্রথমবার ছেলেটার মা কমোডে ফেলে দিয়েছে। দ্বিতীয়বারেরটা আসেনি, পুলিশের কাছে জমা। কী করব?...কেস জন্ডিস!...দামি মাল।...টাকা খরচা করে কে পাঠাবে... ঠিক ঠিক... নারকোটিক্সের বড়বাবু বিশ্বদীপ ব্যানার্জি, দাঁড়ান জেনে বলছি।’

সৌম্যশংকর ফোনে হাত চাপা দিয়ে বললেন, ‘আপনারা যে বড়বাবুর সঙ্গে মিট করেছেন ওনার নাম কী বিশ্বদীপ ব্যানার্জি?’

অমিত্রসূদন ঘাড় নাড়াল। ‘হ্যাঁ।’

‘হ্যাঁ স্যার, বিশ্বদীপ বাবুই ডেকেছিলেন। কথা বলেছেন। আপাতত ভালো কথাই বলছেন...। উনি আপনার চেনা! ভালো মানুষ। শিল্প সংস্কৃতির মানুষ। বাহ! বিশ্বদীপবাবু স্টুডেন্টদের খুব হেল্প করেন, আচ্ছা। তবু আপনাকে একটু বলা থাকল। অল্প বয়সি ছেলে কোনও কিছু স্বীকার করেনি, যদি প্রমাণ থাকে আপনি একটু কথা বলে দেবেন। একটা ওয়ার্নিং। ঠিক আছে স্যার। আমি আপনার শরণেই থাকলাম। হ্যাঁ স্যার, জানি স্যার, ড্রাগ কেসে কোনও পলিটিক্যাল পার্সন নাক গলাতে চায় না। সবার ঘরে ছেলে মেয়ে আছে। সবাই চায় সমাজ থেকে এই পাপ নির্মূল হোক, জানি স্যার, কেউ বলবে না, কোনও রিকোয়েস্ট করা যায় না। ঠিক আছে স্যার, তবু একটু দেখবেন। ছেলেটা ড্রাগ অ্যাডিক্টেড নয়। এই তো আমার সামনে বসে আছে, ফুটফুটে তাজা, ইয়াংম্যান। ড্রাগ নিলে চেহারা ছুরৎ দেখলেই বুঝতে পারতাম। ওকে কেউ ফাঁসাচ্ছে স্যার। ভয়ের কিছু নেই বলছেন, আপনার ভরসায় থাকলাম স্যার।’

ফোন ছেড়ে সৌম্যশংকর বললেন, ‘নারকোটিক্সের বড়বাবু বিশ্বদীপ ব্যানার্জি খুব ভালো মানুষ। বলছে তো ভয় নেই। ভয় নেই মানে, কিছু না-করলে ভয় নেই। কিছু করলে কিন্তু এক্ষেত্রে বড্ড বেশি ভয় আছে। পুলিশ প্রশাসনের ভালো মানুষরাই আসলে আমাদের কাছে খারাপ মানুষ। কিছুতেই কথা শোনে না। কোনও সেটআপ করা যায় না। একগুঁয়ে ঘাওড়া হয় আর কী! আপনার ছেলে তো কিছু করেনি। নির্দোষ। নির্দোষ হলে ভয়ের কিছু

নেই। আর ভালো মন্দ কিছু হলে আমাকে ফোন লাগাবেন। আমি আছি। ভয় পাবেন না। টেনশন করবেন না।'

সুপ্রভাত বলল, 'তুই কিন্তু আছিস। যেভাবেই হোক ছেলেটাকে বাঁচাতেই হবে। দোষ করলে ক্ষমা করে মূল স্রোতে ফেরাতে হবে। জেলে ঢুকিয়ে ক্রিমিনাল বানাতে চাইছি না। আর নির্দোষ হলে, এই মানসিক টর্চার বন্ধ করতে হবে।'

সৌম্যশংকর হাসলেন। 'আসলে কি জানিস, এখনকার বাপ মা-রা ছেলে মেয়েকে বেশি করে দেখতে চেয়ে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে দরকার সেখানে নজর করছে না। ঠিক আছে, যা। আমি আছি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অমিত্রসূদন ফিসফিস করে সুপ্রভাতকে বলল 'ওনার ফিজ?'

'আরে না, না, ও আমার বন্ধু! কী রে সৌম্য তোকে কী দিতে হবে?' সুপ্রভাত হাসতে হাসতে বলল।

'আরে না না, আপনি আর আপনার মিসেস দুজনে মিলে ছেলের সঙ্গে কথা বলুন। না পারেন আমার কাছে নিয়ে আসুন। আমি ওর সঙ্গে কথা বলে বাস্তবটা বোঝাব। শুনুন, ওকে বলবেন, গাঁজা খেলে ৩০ দিন পর্যন্ত রক্ত পেচ্ছাব পরীক্ষা করে পাওয়া যাবে। এমনকী চুলের নমুনা থেকেও পাওয়া যায়। লুকনোর জায়গা নেই। এমডিএমএ, কোকেন ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যায়। কত ধানে কত চাল বাপধনরা বোঝে না। দু- একটা কেসের গল্প শোনালে ও সেঁকে যেত।'

অমিত্রসূদন প্রায় বিড়বিড় করার মতো বলল, 'আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি। ও ঠিক ওরকম নয়।'

সৌম্যশংকর বললেন, 'আবার আপনি বিশ্বাসের গল্প বললেন। দাদা, বিশ্বাসের মা মারা গেছে। এক ফোঁটাও বিশ্বাস করবেন না। কাউকে না। কাউকে না। পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সেজে থাকবেন না। তাহলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী!'

বাইরের রাস্তায় পা দিয়ে অমিত্রসূদনের মাথা কেমন টলে উঠল। সে সুপ্রভাতকে বুঝতে দিল না, তাহলে সুপ্রভাত এটা নিয়ে বড্ড হইচই করবে। অমিত্রসূদন বলল, 'চলো সুপ্রভাত চা খাই।'

চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে সুপ্রভাত বলল, 'অমিতদা আমি কিন্তু আর্যকে বিশ্বাস করি। সৌম্যর কথায় বিশ্বাস হারিও না। বিশ্বাস কিন্তু বড় শক্তি। আমাদের মুনি ঋষিরা তাই বলেন।' অমিত্রসূদনের হঠাৎ নিজেকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না। ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো? অত বড় স্করপিও গাড়িটাকে সে ভরসন্ধেবেলায় ষাঁড় ভাবল!

ষাঁড় ভাবল কেন?

চোদ্দো

মধ্যরাতে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির পিছনে শিং ঘষতে ঘষতে ষাঁড়টা যেভাবে গোঁ গোঁ করে তেমনই একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ এখানে। ইদানীং অমিত্রসূদন যেন বার বার ষাঁড়টাকে বিভিন্নভাবে দেখছে। হ্যালুসিনেশন ম্যাজিক মাশরুম না খেয়েও জীবিত বস্তুর সঙ্গে তার সংযোগ হয়ে যাচ্ছে? শুধু চারদিকে তার রঙের স্রোত নেই, বরং ভয়ের কালো স্রোত।

সামনে একটা কালো পোস্টার, তাতে সাদা করোটি! তার নীচে চারজন ছেলে মাথা নীচু করে কাঠের বেঞ্চে বসে আছে। ওরা কি রঙিন স্বপ্ন দেখে? একজন দু'হাত কানে চাপা দিয়ে। চেয়ারে বড়বাবু বিশ্বদীপ নেই। ঘরের দিকে তাকিয়েই দেখল পুরো ডিপার্টমেন্টে যে যার কাজে মগ্ন। আগের দিনের শ্যামলবাবু ওদের ইশারায় বসতে বলল। মুখ ফিরিয়েই অমিত্রসূদন শুনল কেউ যেন তীব্র স্বরে চিৎকার করে উঠল।

বুকের ভেতর হিম হয়ে গেল অমিত্রসূদনের। কে এমন চিৎকার করছে? এরপর চিৎকারটা মাঝে মাঝে হয়েই চলল। যতবার হল ততবারই বেঞ্চে বসা একটা ছেলে কানে চাপা দিল। অমিত্রসূদন তাকাল আর্যনীলের দিকে। চিৎকারটা বড় অসহ্য। আর্যনীল উঠে দাঁড়াল। তারপর সামনের করিডরটা দিয়ে ঘুরছিল। একজন এসে আর্যকে বলল—ওখানে গিয়ে চুপ করে বসো। বেঞ্চে ফিরে এল আর্য। কিন্তু যেন চুপ করে বসতে পারল না। ছটফট করছে। অস্ফুট গলায় বলল, 'আমাদের তো বারোটার সময় আসতে বলেছিল।'

অমিত্রসূদন চুপ করে থাকল। আর্য বলল, 'এখন প্রায় টুয়েলভ ফিফটি।'

অমিত্রসূদন নীচু গলায় বলল, 'আমাদের কি কোনও সময় বলেছিল?'

'বলেনি, বলেছিল স্যাটার ডে এই সময় আসতে। এই সময় মানে বারোটা। বাবি তুমি আর টেন মিনিটস দেখো। ঠিক একটা বাজলে ওদের, ওই শ্যামলবাবুকে বলে, —চলো।'

একটা বাজতেই আর্য উঠে দাঁড়াল। অমিত্রসূদন শান্ত গলায় বলল, 'চুপ করে বস। প্রয়োজনে বিকেল পর্যন্ত বসে থাকব। অফিস বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকব। যতক্ষণ না ওরা বিরক্ত হয়ে বলবে বাড়ি যান ততক্ষণ বসে থাকব। এত অধৈর্য হলে হবে না।'

'আমি হলে চলে যেতাম।'

'আমার সঙ্গে যখন এসেছিস আমার কথা শুনে তোকে চলতে হবে।'

'ঠিক আছে বসে থাকো। আমি বসে আছি।'

একটা পনেরোয় হন্তদন্ত হয়ে বিশ্বদীপ ঢুকল। ঢুকতে ঢুকতে ওদের দেখে বলল, 'জাস্ট পাঁচ মিনিট, আমি ডেকে নিচ্ছি।' চেয়ারে না বসেই বিশ্বদীপ চিৎকার করে রবিকে ডাকল। দৌড়ে এল রবি। বলল, 'এদিকের খবর কী? কিছু স্বীকার করল? আর কারও নাম বলল — ও কার কাছ থেকে কিনছে?'

'ও তাদের চেনে না।'

'সব চেনে। ওদের ভয়ে নাম বলছে না। অথবা আশায় আছে ওরা ওকে ছাড়িয়ে নেবে। ওক্কে, আজ তো হয়ে গেল। কাল রবিবার। ঠিক আছে, ওকে পরশু কোর্টে চালান করব। তা মারধর করেছিস নাকি?'

'না, না, মারব কী, মারলে তো মরে যাবে। বডির অবস্থা দেখেছেন স্যার। পুরো ঝাঁঝরা। লাঠিটায় হাত দিলেই চিৎকার করছে। দু-চারটে থাবড়া থুবড়ি দিয়েছি।'

'ঠিক আছে ওকে ডেকে নিয়ে আয়। আর শোন, বাইরে বসে আছে আর্যনীল দাশগুপ্ত ওদের ডেকে দে।'

রবি ডাকতে আসার আগেই অমিত্রসূদনরা রেডি হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর বলার আগেই ঘরের কাছেই চলে এসেছে।

'আসুন। রবি আমাদের একটু চা খাওয়া।' আর্যর দিকে তাকিয়ে বিশ্বদীপ হাসল, 'আবার তোকে এই বাজে তিতকুটে চা-টা খেতে হবে।'

‘না, আঙ্কেল আমি চা খাব না।’

‘আরে বাজে হলেও খা, অভ্যেস কর। এখানকার ভাত রুটি আরও খারাপ। মুখে দিতে পারবি না। ভেতর থেকে ঠেলে বের করে দেবে। বমি আসবে। তখন দেখবি খিদের জ্বালায় সব খেয়ে নিচ্ছিস। দাঁড়িয়ে রইলি কেন বস।’

বিশ্বদীপের কথা শুনে অমিত্রসূদনের বুকের ভেতর মর্গের শূন্যতা নেমে এল। অমিত্রসূদন আর আর্যনীল আজ পাশাপাশি বোসে।

রবি, আরও তিনজনকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। ‘স্যার এই যে আপনার নিমাই।’

বিশ্বদীপ ছেলেটার দিকে তাকায়। ‘নিমাই তোর বন্ধুরা সবাই বলেছে, তুই ওদের মাল বিক্রি করিস। ওরা বাইরে বসে আছে। কোর্টে উঠেও ওরা তোর কথা বলবে। তোর বছর দশেক জেল হবে। কোনও বাপ তোকে বাঁচাতে পারবে না। ওটা পাক্কা। আরও দু-চারজনকে খাড়া করতে পারলে—ফাঁসিও হতে পারে।’

নিমাই ছেলেটা চুপ করে দাঁড়িয়ে।

বিশ্বদীপ বলল, ‘দেখ এখনও বলছি ভেবে দেখ। আমি ইচ্ছে করলে আজই কোর্টে তুলে তোর খেল খতম করে দিতে পারতাম। কিন্তু তোর বাবা-মায়ের কথা ভেবে আমি তোকে আমাদের কাছেই রাখছি। যদি তুই তোর দাদাদের নাম বলিস, আমরা তোকে ছেড়ে দেব। তোর গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আমি থাকতে কারও ক্ষমতা নেই। তোর কোনও ভয় নেই। দেখ, ভেবে দেখ। যা, ওকে নিয়ে যা। চা বিস্কুট ছাড়া কিছু খাইয়েছিস? যা, এক প্যাকেট বিরিয়ানি নিয়ে এসে ওকে খাওয়া। আর রবি একটু দাঁড়িয়ে যা।’

ওকে নিয়ে আর দুজন চলে যায়। ওদের চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে বিশ্বদীপ। তারপর খুব চাপা স্বরে বলে, ‘রবি তুই কি ওকে মেরেছিস?’

ছিটকে উঠে রবি কিছু বলতে যায়। বিশ্বদীপ বলে, ‘আমি তোকে বার বার বলছি, এদের গায়ে একদম হাত দিস না। তোকে কিন্তু একদিন জেল খাটতে হবে। এরা সব মৃত্যুর আগের স্টেশনে ওয়েট করছে। আর কবে বুঝবি? কেন ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করছিস?’

রবি অস্বীকারের ঢঙে বলে, ‘না, না, স্যার, ওকে মারতে হয় নি, এমনি চিৎকার করে।’

বিশ্বদীপের পাশে খুব শান্ত মুখে বসে থাকা একজন অফিসার এতক্ষণ বসে বসে ফাইল দেখছিলেন, তিনি মুখ তুলে রবির দিকে কড়া চোখে তাকালেন, ‘আজ দশটা থেকে তিন-তিনবার আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে গেছি, ওকে থামাতে। আপনি একটা নোট দিয়ে দিন। নইলে আপনার রবীন্দ্রনাথ ঘড়ুই শান্ত হবে না। ও নিজে বিপদে পড়বে, আমাদেরও বিপদে ফেলবে। তুই মারিসনি, মিথ্যে বলছিস—’

বিশ্বদীপ বলে, ‘বিরিয়ানি এনে খাওয়ানোর সময় কায়দা করে জেনে নিবি, ও কখন নেশা করে। টাইমটা কী? সেইরকম মাল রেডি রাখবি। যদি উইথড্রল সিনড্রোম হয়, ও যা

খায় সামান্য হলেও ধরিয়ে দিবি। নইলে সামলাতে পারবি না। বিচ্ছিরি অবস্থা হবে।'

'তা হবে স্যার, এ ছেলে বহুত অ্যাক্টর, হেব্বি নাটক করে।'

'রবি এই লাস্ট ওয়ার্নিং—মারধর চলবে না। আর একবার হলে আমি তোমার নামে নোট দিয়ে দেব।'

রবি ঘাড় নেড়ে নেড়ে বিড়বিড় করে, 'আচ্ছা স্যার, আর হবে না।' চলে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঘড়ুই চলে যেতেই শ্যামল আসে। শ্যামল বলল, 'স্যার আজ বিকেলে তো আমার এয়ারপোর্টে যেতে হবে—ওই কেসটা আছে। আজ সাড়ে পাঁচটার ফ্লাইটে নামবে। ছেলেটা কী খায়, মালটা আমি লকার থেকে বের করে কাকে দিয়ে যাব?'

'কী খায় জানুক। আপনি রবিকে দেবেন না। আপনি বরং সাহাবাবুকে দিয়ে যাবেন। আমি ওকে বলে যাব আজ এখানে থাকতে। ওর মাথা শান্ত, রবিকে মারতে বারণ করুন। আপনারা থাকেন কী করতে? একটা মরলে সবাইকে জেল খাটতে হবে, তখন বুঝবেন।'

ওরা চলে যেতেই বিশ্বদীপ শান্ত হয়ে বসে। 'তাহলে আর্য বল, তোর কী খবর?'

'নাথিং, কোনও খবর নেই আঙ্কেল।'

'তোকে বললাম, টেনশন করিস না, একদম স্বাভাবিক থাক, অথচ তুই কলেজ ডুব মারলি?'

আর্য মাথা নীচু করল। 'তুই টেনশন করিসনি, টেনশন তোর বাবা-মা করেছে তাই তো। তোকে তো আমি বললাম একদম স্বাভাবিক থাক।' বিশ্বদীপ তাকাল অমিত্রসূদনের দিকে। 'এই দু-তিনদিন নিশ্চয়ই বিস্তর টেনশন করেছেন। দু-চারজন বন্ধুবান্ধবকে বলেছেন, উকিল টুকিলও ঘুরে এসেছেন নির্ঘাত। একটা কথা বলি অমিত্রবাবু, আর্য বা আপনার সঙ্গে আমি একটুও ফালতু কথা বলছি না। কোনও মিথ্যে স্তোকও দিচ্ছি না। আমি আপনাদের ভালো চাই।

এই যে এখুনি ছেলেটাকে দেখলেন, আপনাদের মতোই আমি এই ছেলেটারও ভালো চাই। আমি লাস্ট পর্যন্ত চেষ্টা করব, ওকে কোর্টে না পাঠিয়ে রিহ্যাবে পাঠাতে। যদি ঠিক করা যায়।

এ মূলত একজন সাপ্লায়ার, কিছুটা নিজে খেত, বেশিটা বিক্রি করত। শুনলে অবাক হবেন, বাংলায় একটা কথা আছে না—কেউ মদ বেচে দুধ খায়, কেউ দুধ বেচে মদ খায়। এ কিন্তু মদ বেচে দুধ খাওয়ার চেষ্টা করেছে। খুব গরিব ঘরের ছেলে। পলিটেকনিক পড়তে ঢুকে পড়ার খরচ চলানোর জন্য প্রথমে এই রাস্তা ধরে। ও প্রায় খেতই না। কেন না ছেলেটার নেশা করার মতো স্ট্যামিনা নেই। নেশা করার গল্প আর অভিনয় করে মাল বিক্রি করত। ও সিগারেটে গাঁজা ভরে বিক্রি করাটা প্রায় কুটির শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। অসাধারণ টেকনিকে ও সিগারেটে গাঁজা ভরে। কিন্তু গাঁজা বিক্রি করে ক'টাকা পাবে। চরস বিক্রি করত। এর পরে ওকে ট্র্যাপ করে বড় মাথা। ওকে দিয়ে এখন লঞ্জেস বিক্রি করাচ্ছে। ইয়াবা। এই সময়েই ও নিজেই আসক্ত হয়ে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কী—ওর মাথার ভেতরকার কম্পিউটারটা ঘেঁটে গেছে। যে ছেলে পড়াশোনার খরচ চালাতে এই পথে আসে, সে-ই পড়াশোনা থেকে দূরে সরে গেছে। বর্তমানে একদিন ঝরঝর করে এই প্রজন্মের বড় একটা অংশ দেখবেন ভেঙে পড়েছে।'

চা নিয়ে এল একটা ছেলে। সবাইকে চা দিয়ে চলে গেল। বিশ্বদীপ বলল, 'বাইরের ওগুলোকে চা বিস্কুট দিয়েছিস?' ছেলেটা ঘাড় নাড়ল।

‘এই যে বাইরে তিনজনকে দেখছেন বসে আছে। এদের সবাইকে পরশু রাতে তুলেছি। টোটাল সাতজন বেশিরভাগই মফসসল থেকে পড়তে এসেছে। কাল এরা সকাল দশটায় হাজিরা দিয়েছে, রাত সাতটার সময় ছেড়েছি। আজ সকাল দশটায় এসেছে রাত সাতটা পর্যন্ত এখানেই বসে থাকবে। নো ফোন। নো কথা। চুপচাপ বসে থাকো। মাঝে দুপুরে আধঘণ্টার জন্য একজন একজন করে ছাড়ব, খেয়ে আসবে। কোনও কেস দেব না। রিহ্যাবে পাঠাব না। এমন চার-পাঁচদিনের পর আর কোনওদিন নেশা করার আগে ওরা একবার অন্তত ভাববে।

কিন্তু যারা অ্যাডিক্টেড হয়ে পড়েছে তাদের কথা আলাদা। তারা আবার করলে এদের রিহ্যাবে পাঠানো হচ্ছে। তাদের মধ্যে কিছু সুস্থ হবে। কিছু লস্ট কেস। যাদের দিন গুনতে হবে। এদের জন্যই লড়াই। কিন্তু আমাদের টার্গেট যারা বিক্রি করছে। সেই মাথাগুলো। আর তাদের সাপ্লাই লাইন।

এই যাকে দেখলেন, এ সাপ্লাই লাইনের একজন। এ রকম অসংখ্য সাপ্লায়ার আছে সারা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুড়ে। এই জাল আমরা কেটে দিয়েছি। বেশ কয়েকজন দারুণ অফিসার আছে আমাদের টিমে। তারাই সারাদিন রাত জেগে এই র‍্যাকেট ওপেন করছে। যেখানে যত নাম পাওয়া যাচ্ছে, প্রতিটা নামের লোককে ওই অফিসাররা ট্রেস করছে। এভাবেই আমরা অনেকের নাম পাই। কিন্তু আর্যর নাম পাই ওই কনসাইনমেন্টটা আসার পর। আমরা খোঁজ করতে শুরু করি। তখনই কেউ কেউ আর্যর নাম বলে। তবে সেগুলো খুব জোরাল নয়। এবার আর্য বলবে—’

আর্য চুপ করে বসে থাকে। মাথা নীচু। বিশ্বদীপ বলল, ‘কথা বল বাবা, তুই না বললে আমাদের সঙ্গে মেলাব কী করে?’

আর্য বলল, ‘নীতিশ।’

‘হ্যাঁ নীতিশ ও প্রতীশ শর্মা। দুই ভাই।’

‘প্রতীশ ভালো ছেলে, এসবের মধ্যে থাকে না। কিছু করবেও না। শুধু নীতিশ।’

‘আমরা মনে করি, দু-ভাই একটা ইউনিট। তবু ঠিক আছে নীতিশই নিলাম। আর?’

‘হিরন্ময়। হিরন্ময় রায়চৌধুরী।’

‘নতুন নাম। বল কেন?’

‘হিরন্ময় ভীষণ খারাপ ছেলে। আমাদের স্কুলের ছেলে। কলেজে গিয়েও ওর সঙ্গে দেখা হয়। প্রচুর পয়সা। ওর এই টেনডেন্সিটা আছে। সবাইকে ভয় দেখায়—গাঁজা কেস খাইয়ে দেব। ও স্কুলে থাকতে অনেকের ব্যাগে সিগারেট ভরে দিয়ে, কেস দিত প্রিন্সিপালের কাছে। এমনও হয়েছে খুব ভালো ছেলে আনন্দ মুহুরীর ওয়াটার বটল হঠাৎ এম.কে স্যার এসে নিয়ে নেন। ওর বোতলের জলে ভদকা মেশানো ছিল। সবার ধারণা হিরন্ময় কোনও একটা ফাঁকতালে ওর ওয়াটার বটলে ভদকা মিশিয়ে দিয়েছিল। আনন্দ মুহুরী স্কুল থেকে এক সপ্তাহের জন্য সাসপেন্ড হয়ে যায়। ও কলেজে এসে আমাকে দু-চারদিন ধরে ডেকেছিল। আমি যাইনি। একদিন এসে খুব খিস্তি করে গেল। বলল, তোকে গাঁজা কেসে জেল পাঠাব। আর একটা কথা হিরন্ময় আগে অনেকের নামেই নানা জিনিস অন লাইনে অর্ডার করে দিত। ক্যাশ অন ডেলিভারি। একবার আমার নামেও করেছে। ঠিক বার্থ ডে-র সময়। আমরা নিইনি। আমি বাড়িতে মায়ের কাছে ব্যাপক ঝাড় খেয়েছিলাম। ওর স্বভাবটাই এমন। আর ইদানীং ও যাদবপুরের ভিকির সঙ্গে মেশে। ভিকিকে তোমরা

নিশ্চয়ই চেনো? ও টোটাল যাদবপুর অঞ্চলে গাঁজার বিজনেস করে। এমনকী এখন বাইরে থেকে চরস, এলএসডি, ইয়াবা আনছে। ভিকির এখন খুব নাম। ওর কাছে গেলে সব ধরনের শুকনো নেশার জিনিস পাবে।'

বিশ্বদীপ হাসে। 'অথচ ভিকি এক টুকরো শুকনো নেশা করে না। মদ খেলে বারে বসে মদ খায়। খুব ঠান্ডা মাথার ছেলে। ভিকি সিং। যাদবপুর থেকে রুবি অজয়নগর পাটুলি বাইপাসটা ওর। খুব পরিচিত ক্লায়েন্ট না হলে ও নিজে মাল দেয় না। পুরো অস্বীকার করে। অপমান করে ফোন কেটে দেয়। তারপর ঠিক তার কাছে ফোন আসে। সাবধানী খেলোয়াড়। ওর মাল বিক্রি করার থেকে বেশি টার্গেট থাকে সাপ্লায়ার বাড়ানো। ওকে পাচ্ছি না। ওকে পেলে বছর পাঁচ ছয় জেলে ঢুকিয়ে রাখতাম। দেখতাম ওর তেজ কত আছে। তবে ওর গেম ওভার। ওর জন্য অন্তত তিনটে ছেলে মারা গেছে। আর সাপ্লাই লাইনের সাতটা ছেলে জেলে। কিন্তু ওকে তুলতে পারিনি। চিন্তা করিস না, হিরন্ময়কে তুলে নেব। তোর সঙ্গে নীতিশের ঝামেলা হয় গার্লফ্রেন্ড নিয়ে, তাই তো। তারপর নীতিশ তোকে বার দুয়েক বন্ধুবান্ধব নিয়ে অ্যাটাক করে। কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি।'

আর্য ঘাড় নাড়ে।

'ঘটনাটা কী?'

'গার্লফ্রেন্ড নয় আঙ্কেল। আমাদের সবার ওর বাড়িতে মিট করার কথা ছিল। আমাদেরই এক বন্ধু, মেয়ে, সে একটু আগে চলে যায়। নীতিশ এই সুযোগটা নিয়েছে। ওর গায়ে হাত দেয়। এরমধ্যে আমরা গিয়ে পড়ি। আমি রাগ চেপে রাখতে পারিনি, ওকে ধরে মারি। প্রীতিশ এসে আমাকে থামায়। আমরা চারজনেই ওদের বাড়ি থেকে চলে আসি। প্রীতিশ এরপরে বার বার বলেছিল ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে। কিন্তু আমরা রাজি হইনি। ও ফ্রান্সে পড়তে গেছে, যাওয়ার আগে আমাকে থ্রেট করে গেছে, ও বদলা নেবে। আমার ধারণা নীতিশ...'

'কেন হিরন্ময় নয়?'

'ফালতু এতগুলো টাকা খরচ করবে কেন?'

'কত টাকা?' বিশ্বদীপ ঝটিতি জিজ্ঞাসা করে।

'আমি বলতে পারব না। তুমি সেদিন বলেছিলে অনেক দাম, তাই বললাম।'

'ঠিক, দামে কী আসে যায়। তোর আমার কাছে যা দামি ওদের কাছে কিছু না। তুই কলেজ গেলে দুশো টাকা মায়ের থেকে পাস। দুশো টাকা তোর কাছে কিচ্ছু না। আবার সকালের শিয়ালদা স্টেশনে যা, ট্রেন ভরে মানুষ শহরে কাজ করতে আসে, তাদের অনেকেরই রোজ দুশো টাকার কম। তাদের দুশো টাকায় সংসার চলে। তোর দুশো টাকা আর ওদের দুশো টাকা সমান নয়। আবার তোর বাবার মাস মাইনের থেকে নীতিশ বা প্রীতিশ বেশি টাকা হাতখরচ পায়। তোর বাবার টাকা আর ওদের টাকার মূল্যমান সমান নয়। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা—' বিশ্বদীপ থামে। পাশের অফিসারের দিকে তাকায়।

পাশের অফিসারটি বলে, 'তোর বন্ধুরা সব বাইরে। তুই প্রায় একা। ভালোবেসে কেউ পাঠাচ্ছে না তো? যদি তাই হয়, স্পষ্ট বারণ করে দে। বল পুলিশ আমার পিছনে ঘুরছে। তাদের নাম বল, আমরা তাদের কিছু বলব না, কিন্তু তারা না বুঝে, বা ভালোবেসে যে ভুল কাজটা করছে, সেটা বুঝিয়ে দেব।'

বিশ্বদীপ বলে, 'আর একটা জিনিস হতে পারে। তুই একা থাকিস, হিরন্ময় লোক দিয়ে বুক করিয়ে জিনিসটা তোর হাতের কাছে ফেলে অপেক্ষা করছে। যদি তুই নিজে কনজিউম করিস। তাহলে পরবর্তীতে তুই ওদের কাছে জিনিসটা কেনার জন্য খোঁজ করবি। অনেকদিন আগে আমার বাবার কাছে শুনেছিলাম রাস্তার মোড়ে মোড়ে নাকি চায়ের গাড়ি দাঁড়াত। মানুষজনকে চা তৈরি করে খাওয়াত। বিনা পয়সায় চা খেতে খেতে মানুষ চা খাওয়াটা রপ্ত করে ফেলল। ঠিক সেভাবে ডালডা চালু করার জন্য কলকাতার রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে লুচি ভেজে খাওয়াত। ওরা এভাবেই তোকে লুচি বা চা খাইয়ে সাপ্লায়ার বানাতে চাইছে! কেননা তুই সব জিনিসই এক আধবার করে ট্রাই করেছিস। ওরা সেটা কাজে লাগাচ্ছে। তোকে আমরা সর্তক করে দিলাম কোনওভাবে এদের ফাঁদে পা দিবি না।'

পাশের অফিসারটি বলে, 'দেখ বন্ধুকে বাঁচানোর চেষ্টা করিস না। তাহলে তুই বিপদে পড়ে যাবি। আমরা যেমন তোকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি, আমরা ওকেও বাঁচানোর চেষ্টা করব। ও যেমন ভালোবেসে তোর ক্ষতি করছে, তুইও তেমন ভালোবেসে ওর ক্ষতি করছিস। বরং কিছু মনে হলে বল, আমরা খোঁজ করি।

আসলে কী জানিস, তোরা কম্পিউটারটা চালাতে জানিস বলে ভাবিস আমরা বোকা। আমি কিন্তু তোকে এক্ষুনি থামিয়ে দিতে পারি, কীভাবে বলব—তোর ল্যাপটপ আর মোবাইল সিজ করে নেব। তুই ডার্ক ওয়েব ইউজ করিস কিনা সেটা পরীক্ষা করার জন্য ব্যাঙ্গালোর পাঠাব। ওটা ফেরত পেতে পেতে এক বছর লাগবে। এবং কী অবস্থায় ফেরত পাবি আমরা বলতে পারব না। তুই দু-তিনমাস পরে আবার ল্যাপটপ এবং মোবাইল কিনলি, আবার সন্দেহ করে আমরা সিজ করে নিয়ে আসব। তোকে কিচ্ছু করব না। আবার কিনলে আবার তুলে নিয়ে আসব। কোন কোর্টে তুই যাবি তোর বাবার কিন্তু চাকরি করা গোনা টাকা। এটাকে কী বলে জানিস—ফিনান্সিয়ালি ব্লক করে দেওয়া। এই ওষুধটা আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য খুব ভালো কাজে দেয়। সব অ্যাডভেঞ্চার, কৌতূহল ছুটে যাবে।'

আর্য কাঠ হয়ে অফিসারটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

অফিসারটি বেশ মজা করার মুখে হাসে। বলে, 'এই খেলাটা কিন্তু আমরা বড়লোক বিজনেসম্যানের ছেলেদের সঙ্গে খেলব না। এক্ষেত্রে আমরা বার বার তাদের বাপদের ডেকে পাঠাব। বাপের সময় নষ্ট করাব। সম্মান নষ্ট করাব। চারদিকে লোকজনদের কাছে খবর পৌঁছে দেব।

আবার, একদম গরিব, রাস্তার ছেলেদের জন্য ওষুধ অন্য। ওই যে রাস্তার ধারে গাঁজা হেরোইন, মানে যারা পুরিয়া বিক্রি করে তাদের ধরি। ধরে থানায় আনি না, কেস দিই না, সেরেফ মালটা কেড়ে নিই। নিয়ে ছেড়ে দিই। তাকে একদম নজরে নজরে রাখি, ধরি আর মালটা কেড়ে নিই। ফলে কী হল বলত, ওর কাছে টাকার সোর্স কমে আসছে। যেখান থেকে মাল নিত, তারা ওকে একবারের বেশি ধারে মাল দেবে না। আর বেশি টাকা ধার হয়ে গেলে ওরাই ওকে পেটাবে। ও চুরি করার চেষ্টা করবে। সেখানেও মার খাবে। কিছুদিনের মধ্যে হয় মরবে, নাহলে পাগলা হয়ে ডাস্টবিনে মরে পড়ে থাকবে। বিভিন্নজনের জন্য বিভিন্নরকম ওষুধ আছে।

'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কেউ যদি তোর সঙ্গে শত্রুতা করে জিনিসগুলো পাঠায়, সেক্ষেত্রে তোর কিছু করার নেই। ঠিক কথা।' বিশ্বদীপ ওই অফিসারের কথার ফাঁকে কথা বলে। 'সেক্ষেত্রে ঝামেলাটা বেশি। আমাদের গুরুজনরা এসময় কী পরামর্শ দিতেন জানিস,

বলত, চোখের আড়ালে চলে যা। হাতের কাছে থাকিস না। আমি তোকে বলব, কিছুদিন ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ইনস্টাগ্রাম সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নে।

স্রেফ ছ মাস। যে করছে তার রাগ পড়ে যাবে। তখন আবার আস্তে আস্তে তুই বাইরে দেখা দিবি। দেখবি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। পাশাপাশি তোর পুরনো বন্ধুরা এলে তাদের সঙ্গে মিট কর, বাবা মায়ের বকাবকির কথা বল। বলে বলবি তোকে নিয়ে কোনও ছবি, কোনও পোস্ট না করতে। রটিয়ে দে তোর বাবা বা মা খুব অসুস্থ। তুই খুব ঝামেলায় আছিস। স্রেফ কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দে।

তোর শত্রু ভার্চুয়াল জগতে লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে বের করার মতো ইনফ্রাস্টাকচার আমাদের নেই। থাকলেও তুই এমন কোনও কেউকেটা নোস যে তোর জন্য সেই অস্ত্র ব্যবহার হবে। তুই কোনও মন্ত্রীর ছেলে হলে এখুনি সাসপেক্টেড সবাইকে তুলে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেত। কিন্তু সেটা তোর জন্য সম্ভব নয়। তোকে নিজেকে সাবধান হতে হবে। লাইফ স্টাইলটা পালটে ফেলতে হবে।

আর এরপর কোনও কিছু বাড়িতে এলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবি। আমাদের লোক গিয়ে কালেক্ট করবে, অথবা তোর বাবা এসে জমা দেবেন। তুই নিয়ে আসবি না। কেননা তুই আমাদের সন্দেহের বাইরে নেই। তোর কাছে আমরা কিছু পেলে তোকে তুলে নেব। কোনওরকম এক্সকিউজ শুনব না।' বিশ্বদীপ তাকাল অমিত্রসূদনের দিকে। বলল, 'আপনাদের আরও একটু বসতে হবে। আপনার ও আর্যর সঙ্গে নারকোটিক্স সেলের প্রধান কথা বলবেন। উনি আইপিএস অফিসার। স্ট্রেট লোক। আর্য ওঁর সঙ্গে টু দ্য পয়েন্ট কথা বলবি। কোনওকিছু গোপন করবি না। উনি যা জানতে চাইবেন বলবি। আমি ওনাকে সব বলে রেখেছি। উনি তোর সঙ্গে একবার কথা বলতে চান। কনসাইনমেন্টটা আসছে বাইরে থেকে। বিষয়টা হায়ার অথরিটি জানে। তারাও একবার দেখে নেবে। বাইরে একটু ওয়েট কর। আমি একটা গাড়ি ডাকি।'

বাইরে গিয়ে বেশিক্ষণ বসতে হল না। কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে এল বিশ্বদীপ। 'চলুন, আমরা লালবাজার যাব।'

পনেরো

এভাবে কোনওদিন লালবাজারে আসতে হবে অমিত্রসূদন ভাবেনি। ক্রমশ যেন সে ভেতর থেকে ভেঙে যাচ্ছিল ঝুর ঝুর করে। তার গলা যেন কেউ টিপে ধরেছে। তার শরীরের সমস্ত পেশী বড় ঢিলে হয়ে আসছে, জোর নেই কোথাও। মুখের পেশীতে হাসি বা কান্নার রেখাগুলো কী অদ্ভুতভাবে মুছে গেছে। গত দু-তিনদিন সে দলের কোনও কাজ করেনি। বলেছে শরীর খারাপ। এতদিন সবাইকে বোঝাত তার এই ছোট্ট নাটকের দলটি আসলে একটি পরিবার। এখানে সবাইকে মন খুলে কথা বলতে হবে। পরস্পরের কাছে স্বচ্ছ হতে হবে। অথচ সে সবকিছু জেনেও স্বচ্ছ হতে পারছে না। খুব ঘনিষ্ঠ দু-একজন বাদে কাউকে কোনও কথা বলেনি। কেন বলেনি? সে কি বদনামের ভয় পেয়েছে? আচ্ছা যদি সত্যি হতো, তাদের অজান্তে তার সন্তান যদি ড্রাগের নেশায় জড়িয়ে পড়ত সে কি এভাবেই লুকিয়ে রাখত? গোপন করত? নাকি তার নাটক দলের সহযোদ্ধাদের কাছে এই দুঃসময় থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাহায্য চাইত?

লালবাজারের ভেতর গাড়িটা ঢুকলে অমিত্রসূদনের ভেতরটা কেমন অস্থির হয়ে উঠল। গাড়ি থেকে নেমে সামনে বিশ্বদীপ তার পিছনে আর্য আর অমিত্রসূদন উঠে এল তিনতলায়।

ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ। নারকোটিক্স সেল।

ওদের দুজনকে পাশের একটা ঘরে বসিয়ে বিশ্বদীপ ঢুকে গেল ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশের ঘরে। বেরিয়েও এল দ্রুত। আর্যকে বলল, 'তোর মতো করে কথা বলবি। টু দ্য পয়েন্ট কথা বলবি। মনে রাখিস, উনি জজ, তুই আসামি। যুক্তি দিয়ে কথা বলে নিজেকে সঠিক প্রমাণ করতে হবে। আমি কিন্তু ওখানে থাকব না। তোর হয়ে কোনও কথাও বলব না। বেস্ট অব লাক!'

আর্য হেঁটে গেল ঘরের দিকে। অমিত্রসূদন দেখছিল—আলো নেই, সাউন্ড নেই, মঞ্চের কোনও ম্যাপিং জানে না ছেলেটা। কতখানি হেঁটে যেতে হবে, ঠিক কোন জায়গা থেকে ডায়লগ ধরতে হবে, কেমন হবে ডায়লগ, কেমন হবে থ্রোয়িং, পারবে তো মুখে আলো নিতে—এত বড় মঞ্চ, সামনে এত নিকষ অন্ধকার, অন্ধকারের ভেতর জ্বলজ্বলে চোখ, ছেলেটা ঘাবড়ে যাবে না তো? উইংসের বাইরে দাঁড়িয়ে অমিত্রসূদন কাঁপছিল।

অমিত্রসূদনের কাঁধে হাত রাখে বিশ্বদীপ। 'উনি ওর সঙ্গে একা কথা বলবেন। আসুন, আমরা ওই ঘরে বসি। আর্যকে নিয়ে আপাতত আমাদের দিক থেকে কোনও ভয় নেই। আশা করি, আজকের পর আর্যকে আর এখানে আসতে হবে না।

কী জানেন, আমরা বালির ভেতর মুখ গুঁজে আছি। চারদিকে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা চলছে। শহরের ভেতর একটা অন্য শহর। ধূসর রঙের শহর। অন্য মানুষ। তারা অন্যভাবে বাঁচছে। আসলে মরছে। আরও পাঁচজনকে মারছে। দেখুন যেগুলো তৃতীয় শ্রেণির নেশা—সিগারেট, তামাক, গুটকা সমাজ এগুলোকে বিধিবদ্ধ সর্তকতা জারি করে ছেড়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে আছে মদ, ফেনসিডিল, ক্যানাবিস গাঁজা বা মারিজুয়ানা। এগুলো মরণের আগের স্টেশন। এক্ষেত্রেও সমাজের অনেক বাধ্যবাধকতা আছে। মদে সরকার দেদার ট্যাক্স কামায়। আর পরিবার, সমাজ হাহুতাশ করে। প্রশাসনেরও মাথা ব্যথার কারণ। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর নেশার জিনিস হল কোকেন, হেরোইন, আফিম, মরফিন, প্যাথডিন, ইয়াবা, এমফেটামিনস এগুলো মারাত্মক। এগুলো মৃত্যুচিহ্ন। সব শেষ করে দেবে। আমাদের বাড়ির দরজায় এগুলো এসে দাঁড়িয়ে আছে। অলিতে গলিতে উন্মত্ত ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এখন আর কেউ ড্রাগস ডিলারের জন্য অপেক্ষা করছে না। কোনও লুকোচুরি, গোপনীয়তা নেই, ঘরে বসে আপনি যে কোনও কেমিক্যাল ড্রাগস অর্ডার করছেন, বিট কয়েনে পেমেন্ট করছেন, আপনার কাছে ড্রাগস চলে আসছে। যেখান থেকে আসছে তার কোনও অ্যাড্রেস থাকছে না। ওদের পাঠানো কোয়ালিটি নিয়ে আপনার কোনও সংশয় নেই। কোয়ালিটি একদম ঠিকঠাক, ঠকার কোনও সম্ভাবনা নেই। সমস্যায় পড়ে যাচ্ছি আমরা। অন্ধকারে হাতড়াতে হচ্ছে। কঠিন একটা লড়াই—।

আমাদের এই লড়াইটা কাদের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে জানেন? এদিকে অ্যাভেঞ্চারাস ছেলে মেয়ে আর অন্যদিকে একদল পাচারকারী।

আমাদের পাশের রাষ্ট্র বাংলাদেশ শেষ। ৭০ লক্ষ মাদকাসক্তের মধ্যে ৫০ লক্ষ ইয়াবা নিচ্ছে। এটা সরকারি হিসেব। বেসরকারি মতে কয়েক গুণ বেশি। ইয়াবাকে ওরা

নিজেদের মতো করে নামকরণ করেছে—বাবা। আগে বাংলাদেশের রুট থেকে পশ্চিমবঙ্গে নিত্য নতুন নামে এই ইয়াবাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। কত নাম—ম্যাড ড্রাগস, ভুলভুলাইয়া, হিটলার্স ড্রাগস, স্পিড, চকোলি, নাজি। সবই আসলে মেথামফেটামিন ও ক্যাফেইন ট্যাবলেট। এখন একে স্ট্রং করতে মেশানো হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, রেড ফসফরাস, ব্যাটারির লিথিয়াম আর নেইল পলিশ রিমুভার অ্যাসিটোন।

বার্মিজরা এই ড্রাগস তৈরি করে। মায়ানমার, বার্মা এক্সপোর্ট করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানি সৈনিকদের মেথামফেটামিন ট্যাবলেট দেওয়া হতো। এর সঙ্গে মেশানো থাকত ক্যাফেইন। এই ট্যাবলেটের কাজ ছিল সৈনিকদের জাগিয়ে রাখা। এই ধরনের ট্যাবলেটগুলো মায়ানমারের শান প্রদেশে পাহাড়ি ঘোড়াদের পাগলা করে দেওয়ার জন্য খাওয়াত। ঘোড়াগুলো পাগলা হলে পাহাড়ি পথে গাড়ি টানা সহজ হত। পরে সেই ঘোড়ার ট্যাবলেট মানুষরা নেওয়া শুরু করল। কেন না তাদের ঘোড়ার মতো প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হতো। এগুলো খেয়ে মানুষও উন্মাদের মতো আচরণ করে, গোয়ার্তুমি করে অসম্ভব পরিশ্রম করে। সেগুলো এখন আমাদের খাওয়াচ্ছে। মারাত্মক নেশার আনন্দ বা মৃত্যু সুখ দিচ্ছে। দু-একটা খেলেই ব্রেনের ভেতরকার রক্তনালী ফেটে যাবে, ড্যামেজ হয়ে যাবে। আর নিয়মিত খেলে ব্রেন স্ট্রোক হয়ে প্যারালাইজড।'

বিশ্বদীপ কথাগুলো বলতে বলতে ঘেমে গেল, অমিত্রসূদনের মনে হল বিশ্বদীপ ভেতর ভেতর তার থেকেও অস্থির হয়ে উঠছে। ওর চোখ মুখে কষ্ট।

'যেভাবেই হোক পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোকে বাঁচাতে হবে। এ শুধু পুলিশ প্রশাসনের কাজ নয়, সবাইকে সচেতন হতে হবে। অমিত্রবাবু, নাটক করুন এই বিষয় নিয়ে। খুব দরকার, খুব জরুরি।' বিশ্বদীপের গলায় আকুতি কিন্তু অমিত্রসূদনের মাথার ভেতর কিছুই ঢুকছিল না। মনে হচ্ছিল, কখন সে দেখবে এক মুখ আলো নিয়ে স্টেজ থেকে বেরিয়ে আসছে আর্য!

বিশ্বদীপের ফোন বাজে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো ইকবাল?...হ্যাঁ, হ্যাঁ...ঠিক আছে। ডায়রেক্ট এখানে নিয়ে এসো। ওক্কে। হ্যাঁ আমি আছি।

ফোন ছেড়ে বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ে বিশ্বদীপ।

'দেখুন, কাকে নিয়ে আসছে এখুনি। এ কিন্তু সত্যিই বীর। একে নেশা করে পালোয়ান সাজতে হয়নি। একে আমরা একসময় বীরপুজো করতাম। কিন্তু অভাব আর স্বভাব ওকে শেষ করে দিল। নে এবার জেলে পচবি। অনেক হয়েছে।

অমিত্রসূদনের কেমন ধোঁয়াশা লাগে, সে যেন বিশ্বদীপের কথা ঠিক বুঝতে পারে না। কোন অন্ধকারের ভেতর থেকে বিশ্বদীপ কথা বলছে?

বিশ্বদীপ বলল, 'এখন কোকেনের দিন শেষ। ১ গ্রাম কোকেনের দাম ১০ হাজার টাকা। কাশির সিরাপ, হেরোইন, ব্রাউন সুগার দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছে। এখন সাম্রাজ্য বানিয়েছে ইয়াবা। এসেই মারাত্মকভাবে বাজার ধরে নিয়েছে। লাল বা গোলাপি রঙের ছোট ছোট ট্যাবলেট। লজেন্সই। ট্যাবলেটের উপরে ইংরেজিতে 'ডব্লিউ ওয়াই' বা 'আর' লেখা থাকে। হালকা মিষ্টি গন্ধ আছে। কলেজ পড়ুয়াদের খুব পছন্দের। গিলে বা চিবিয়ে খেয়ে নিচ্ছে। আবার গুঁড়ো করে নাকে টেনেও নেশা করছে। দাম একশো টাকা থেকে পাঁচশো টাকা। এক হাজার ট্যাবলেটের ওজন ১০০ গ্রামেরও কম! যে কোনও জায়গায় লুকিয়ে

পাচার করা যায়। মুনাফা অনেক অনেক বেশি। তাই ইয়াবা নিয়ে পাচারকারীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা দেখছে গোরুপাচারের থেকে ইয়াবা পাচারে লাভ অনেক অনেক বেশি।

এই ট্যাবলেটের মূল ক্রেতা বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালে আমদানি করা হয়েছিল প্রায় ৩০ কোটি ইয়াবা ট্যাবলেট! কয়েক হাজার কোটি টাকার ব্যাবসা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যাপক ধরপাকড়ে প্রায় ২৫ হাজার মাদকপাচারকারী ধরা পড়েছে। ঢাকার মহম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্প এলাকার ইস্তিয়াক আহমেদ, করাইল বস্তির বাবা কাসেমের মতো মাদক কারবারীদের অঙ্গুলিহেলনে বাংলাদেশের ড্রাগ ব্যবসাটা চলে, এদের পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না।

আগে বাংলাদেশে ইয়াবা আসত মায়ানমার থেকে সরাসরি নাফ নদী পেরিয়ে টেকনাফ দিয়ে। এখন সেটা রুট পালটে আসছে কলকাতায়। মায়ানমার থেকে মণিপুর-মিজোরাম হয়ে সড়ক পথে কলকাতায়। বিভিন্ন এলাকায় স্টোর হচ্ছে। পরে বাংলাদেশ থেকে কেরিয়ার এসে নিয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ ট্যাবলেট।

অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী ইয়াবা স্টক করছে। এক লাখ টাকার ট্যাবলেট এক সপ্তাহ পরে বিক্রি হবে তিন লাখ টাকায়! এই লোভে ইয়াবা ব্যবসার নয়া করিডর হচ্ছে আমাদের কলকাতা।

অমিত্রবাবু, কলকাতার ভেতর আরেক কলকাতা। তবে আপনার ছেলে আর্যর কাছে ইয়াবা আসেনি। ওর কাছে এসেছে কেমিক্যাল ড্রাগ। সুগার টিউব। শুধু সেটা সুগার কিউবের মতো সাদা নয়, হালকা বাদামি। দেখতে অবিকল সুগার কিউব। তাই ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু এই কিউবের মধ্যে দেওয়া আছে তরল এলএসডি। যার নেশা মারাত্মক। শরীরের সমস্ত সিস্টেম এরা ভেঙে দেয়।

আমাদের স্নায়ুতন্ত্র বাইরে থেকে নানা অনুভূতি মস্তিষ্কে বয়ে নিয়ে আসে। মস্তিষ্কে নানারকম নিউরোট্রান্সমিটার আছে। এরা নিউরন থেকে নিউরনে সিগন্যাল পাঠায়। নিউরোট্রান্সমিটারের কাজ করার জন্য মস্তিষ্কে নিউরেট্রান্সমিটার রিসেপ্টর থাকে। সঠিক রিসেপ্টরে সঠিক নিউরোট্রান্সমিটার টাচ করলেই আমাদের ভালো লাগে, মন্দ লাগে, বা ভয় পাই। সাইকোডেলিক ড্রাগ নিলে এরা নিউরোট্রান্সমিটারকে সরিয়ে নিজেরাই রিসেপ্টরকে টাচ করে। ফলে বাইরের জগৎ থেকে আসা অনুভূতিগুলো আর আমাদের কাছে কোনও অনুভব হয়ে ওঠে না। তখন সম্পূর্ণটাই সাইকোডেলিক ড্রাগস কন্ট্রোল করে, যা অনুভব করায় আমরা তাই অনুভব করি। একটা সময় এই ড্রাগের নেশা আর পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে না, তখন এটা একটা ব্রেনের অসুখ হয়ে দাঁড়ায়, ব্রেনে একটা ট্রিগার কাজ করে। তখন সেই ট্রিগার ব্রেন থেকে সিগন্যাল পাঠায় ড্রাগস নিতে হবে। নেশা করতে হবে। খাও এক্সট্যাসি, এলএসডি খাও আর তীব্র রঙের স্রোতের ভেতর পড়ে থাকো।

এটা সদ্য ঢুকেছে কলকাতায়। বড়লোক ছেলেদের রেভ পার্টিতে চলছে দেদার। এমডিএমএ বা এক্সট্যাসি, এলএসডি, ম্যাজিক মাশরুম সব সব। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে নানাভাবে কলকাতায় আসছে। তারপর কলকাতা থেকে এই ড্রাগস ছড়িয়ে পড়ছে মুম্বই-দিল্লি-বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদের পার্টি সার্কিটে। মুম্বই-দিল্লি থেকে এসব ড্রাগস যাচ্ছে পাকিস্তানে আর বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদ হয়ে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কায়। সবার কেন্দ্রে কিন্তু এই কলকাতা। ছোট ছোট হোমিওপ্যাথির শিশির মতো দেখতে শিশিতে আসছে লিকুইড। তারপর সেটা মিশছে সুগার কিউবে। এক একটি কিউবের দাম তিন-চার হাজার টাকা।

যেটা আপনাদের বাড়িতে এসেছে, কেউ আর্যর জন্য অন্তত বারো হাজার টাকা খরচ করেছে। কেন? সে কী চায় আর্য এগুলো হাতের সামনে পেয়ে নেশা করুক। নাকি ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ুক? কেন এত রাগ! এই রাগ তো ড্রাগের থেকেও ভয়ানক। আমি ওকে বলেছি, আপনারাও বোঝান, ওকে আপাতত নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে বলুন। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ইমিডিয়েট অফ হওয়া ওর দরকার। ওকে যেন ওরা না আর দেখতে পায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ রাগ বেশিদিন থাকবে না। সে দু-দুবারে প্রায় ২৫ হাজার টাকা খরচ করেছে। এবার মনে হয় থেমে যাবে।

কথা শেষ করে বিশ্বদীপ থামে আর তখনই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে জনা পাঁচেক। ওদের সঙ্গে একজন নাইজেরিয়ান। নাইরেজিয়ান মানুষটিকে দেখে চমকে ওঠে অমিত্রসূদন। আরে এ যে এমানুল আকুয়া। গড়ের মাঠে মাত করে দেওয়া ফুটবলার। দু-দুটো বড় ক্লাবে খেলেছে এমানুল, বিশ্বস্ত ডিফেন্ডার।

এমানুলকে দেখেই হাত বাড়িয়ে দিল বিশ্বদীপ। বলল, 'তোমাকে একবার চান্স দিয়েছিলাম এমানুল। তুমি কথা রাখতে পারলে না। পরশু তুমি এয়ারপোর্টে এনসিবিকে ফাঁকি দিয়েছ। আমরা জানতাম ওই প্লেনে মালটা আসছে। কিন্তু কে নিয়ে আসছে, সেটা জানতাম না। কিন্তু যখনই প্যাসেঞ্জারস লিস্টে তোমার নাম দেখলাম তখনই আমি নিশ্চিত ছিলাম, জিনিসটা তুমিই আনছ। কিন্তু এয়ারপোর্টে এনসিবি'র রুটিন সার্চিং-এ তুমি ধরা পড়লে না, সেই তখন থেকে তোমার পিছনে একজনকে লাগিয়ে রাখলাম। মাল তুমি আনোনি তবে মালটা আনল কে? আনল যদি, তোমাকে দেবে কীভাবে? কবে? তুমি ফিরে এসে লাস্ট দুটো দিন ঘরবন্দি হয়ে থাকলে। আজ যখন বেরিয়েছ তখনই জানতাম, আজ তুমি মালটা কালেক্ট করার চেষ্টা করবে। কী তাই তো?'

এমানুল কাতর গলায় বলল, 'লাস্ট ওয়ার্নিং স্যার। প্লিজ স্যার, আমার ছোট মেয়েটা সিরিয়াসলি ইল। আমার তিন মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি। আমি খুব টেনশনে আছি স্যার। টেনশনে একটু এক্সট্যাসি নেব বলে কিনতে গিয়েছিলাম। এরা আমাকে অ্যারেস্ট করেছে স্যার।'

'এবার তোমাকে আর কেউ বাঁচাবে না। আমি জানি তোমার অভাব। কিন্তু আর কিছু করতে পারলে না! এটা থার্ড টাইম। কেমিক্যাল ড্রাগ ঢোকাচ্ছ শহরে। আর তোমাকে ছাড়া যাবে না এমানুল। বসো। চুপ করে বসে নামগুলো বলো। আজ স্বীকার তোমাকে করতেই হবে। এবার তুমি জেলের হাওয়া খাবে।'

এমানুল দু-দিকে হাত ছাড়িয়ে চোখ বন্ধ করে বসল। বড় শরীর, নিখুঁত করে দাড়ি গোঁফ কাটা মুখটা তেল চকচক করছে। বন্ধ দুচোখ কুঁচকে আছে।

বিশ্বদীপ বলল, 'কার কাছ থেকে কালেক্ট করছিল? সে কোথায়?'

ছেলেটি হাসে, 'আপনাকে সারপ্রাইজ দেব বলে তাকে বাইরে বসিয়ে রেখেছি স্যার। ওকে আনব স্যার?'

'ডাক, ডাক, মহাপুরুষটিকে দেখি।'

একজন ঘরের বাইরে যায়। তার সঙ্গে একজন ঢোকে। তাকে দেখে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, কী যেন নাম, তুমি তো ডি জে, কোন ক্লাব? ব্লু সিটি? তাই তো? আরে বাহ!'

'ডিজে হংসরাজ স্যার।'

'তা ডিজে সাহেবের সঙ্গে কী ছিল?'

‘লিকুইড এলএসডি, এমডিএমএ-এক্সট্যাসি।’ একজন বলল।

আর একজন বলল, ‘প্রায় কুড়িটা অ্যাম্পুল। একটা অ্যাম্পুলে ১০ গ্রাম করে আছে। আর হিউজ এক্সট্যাসি ট্যাবলেট সঙ্গে ছিল।’

‘দারুণ—প্রচুর মার্কেটিং করে এনেছিস? তা কী করবি এগুলো দিয়ে রেভ পার্টি? কবে, কোথায় আছে?’

‘না, স্যার কোনও পার্টি নেই। নিজের জন্য কিনেছি। আমিই খাই।’

‘তুই খাবি এতগুলো?’

‘হ্যাঁ স্যার। সারা বছরের জিনিস সস্তায় পেলাম কিনে রেখেছি। —এমানুল বলল, তাই ওকে একটা গিফট করতে এসেছিলাম।’

বিশ্বদীপ হাসে, ‘আমাদের বোকা পেয়েছিস? একটা গিফট করতে এসেছিস তো সঙ্গে এতগুলো ছিল কেন?’

‘এমানুলকে দেখাব বলে…।’

‘এখন কী করবি আমরা তো দেখে ফেললাম।’

ডিজে হংসরাজ খুব স্মার্ট গলায় বলে, ‘স্যার খাওয়ার জন্য নিয়েছি। আমার রোজ লাগে স্যার। খুব টেনশনে থাকি স্যার।’

‘খুব টেনশন?’

‘খুব টেনশন স্যার।’

‘টেনশনের কিছু নেই। আর কারা কারা আছে নাম বল। আমি তোকে ছেড়ে দেব।’

‘আর কেউ নেই স্যার। আমি খাওয়ার জন্য এনেছি। একদম নিজের খাওয়ার জন্য ‘গড প্রমিস স্যার।’

বিশ্বদীপ শান্ত গলায় বলল, ‘আহা এর মধ্যে আবার গডকে টানছিস কেন? আর কেউ নেই, ঠিক বলছিস? কোনও নাম বলবি না—এদের কোথা থেকে তুলেছিস?’

‘সল্টলেক, জিডি ব্লকের বিগ বাজারের সামনে থেকে স্যার। স্যার ধরার সময় এমানুল হাত চালিয়েছে। যোগেশবাবুর মুখ ফেটে গেছে। শুনলাম একটা দাঁত আউট। ওকে পাশের ক্লিনিকে দিয়ে এসেছি।’

‘ও এমানুল হাতও চালিয়েছে! ভালো। এমানুলের খেল খতম। ওর বউ বাচ্চা এবার মায়ের ভোগে যাক। অনেক বউ বাচ্চা গরিবি দেখিয়েছে। আমি হংসরাজের কথা বলছি, তোলার সময় হংসরাজকে কি কেউ দেখেছে?’

‘না, স্যার ওকে কেউ দেখেনি।

ও কাউকে ফোন করেছিল নাকি?’

‘না। সঙ্গে সঙ্গে ফোন কেড়ে নিয়েছি।’

‘গুড। ওর খুব টেনশন। আর ওকে নিয়ে আমাদের টেনশন। আজ দু-দিকের টেনশনই খতম করে দে। ওকে নিয়ে যা, এখন আটকে রাখ। রাতে দশটা নাগাদ বের করবি। গাড়িতে তোলার আগে হাঁ করিয়ে দশটা এলএসডির অ্যাম্পুল ওর মুখে ঢেলে সেক্টর ফাইভের কোথাও ফেলে দিবি। কাল সকালে সল্টলেক পুলিশ ওর ডেডবডি তুলে নেবে।’

বিশ্বদীপের কথা শুনে চকিতে তাকাল অমিত্রসূদন। বিশ্বদীপের মুখটা কঠিন, না, কথাটা যেন কথার কথা নয়। সে আঁতকে উঠল। হংসরাজ কেঁদে ফেলল হাউ হাউ করে। বিশ্বদীপ ঠান্ডা গলায় বলল, ‘শোন, ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যা। যদি আর কোথায় কী মাল আছে না বলে, আর কারা কারা আছে না বলে, ওকে আমি দেখিনি, ওকে আমি চিনি না, ওকে তোরা ধরিসনি। ওপরের অর্ডার আছে। সাফ করে দে। দশটা থেকে এগারোটা। ফেলে দিয়ে আসবি।

একজন বলল, ‘স্যার মিডিয়া খবর পেয়ে গেছে!’

‘কী খবর পেয়েছে?’

‘এমানুলকে আমরা ধরেছি। তবে ওরা কনফার্ম নয়।’

‘এমানুলকে পরশু কোর্টে তুলব। হংসরাজের কাছ থেকে যা যা পেয়েছিস, এগুলো সব এমানুলের। সব এমানুলের নামে এন্ট্রি কর। ওরা একই ফ্লাইটে ফিরেছে, বা আগে পরে এসেছে। তাই তো হংসরাজ? আজ হংসরাজের ব্যবস্থা করে দে। পরশু এমানুলের হয়ে যাবে।’

একজন বলল, ‘স্যার ওকে তাহলে ওর গাড়িতে করেই নিয়ে যাব। ওর গাড়িও আমরা নিয়ে এসেছি।’

‘ও কাজ গুছিয়ে রেখে এসেছিস। ডিজে হংসরাজ তোমার লাইফ লাইন চালু। রাত দশটা। তারপর আর সময় পাবে না। যা চলে যা।’

হংসরাজ বিশ্বদীপের হাত পা ধরার চেষ্টা করে, ‘স্যার, একটা চান্স দিন স্যার।’

‘আমার যা বলার বলে দিয়েছি। ওপর থেকে আমাদের কাছে এমনই অর্ডার আছে। শোন, শোন বাংলাদেশ সরকার দুশো ড্রাগ পেডলারকে মেরে সাফ করে দিয়েছে। আমরা তো সবে নম্বর লাগানো শুরু করেছি। তোর নম্বর লেগে গেছে, তুই চলে যা। নাহলে ওদের হেল্প কর, বেঁচে যাবি।’

হংসরাজ বসে ছিল, কিছু বলার চেষ্টা করছিল, ওদের একজন হংসরাজের গালে একটা চড় মেরে টেনে নিয়ে চলে গেল।

বিশ্বদীপ বলল, ‘তাহলে এমানুল একটু বসো। তোমাকে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই। ছেলেরা এত বড় একটা মাছ শিকার করল। কাল প্রেস আসবে, মিডিয়া আসবে, ওনাকে একবার জানিয়ে রাখি।’

ঘরের ভেতর আর্য এসে দাঁড়াল। শান্ত মুখ। চকচক করছে। আর্য বলল, ‘বাবি তোমাকে উনি একবার ডাকছেন।’

বিশ্বদীপ বলল, ‘আপনি যান, দেখা করে আসুন।’

ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ মিস্টার হরিহরণ। ঘরে ঢুকতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, ‘মিস্টার দাশগুপ্ত, আর্যর সঙ্গে আমি এতক্ষণ গল্প করলাম। আপনার ছেলে খুব ভালো। ওর কোনও সমস্যা নেই। ওকে আমার কার্ড দিয়েছি। পার্সোনাল ফোন নম্বর দিয়েছি। ওর কোনও ভয় নেই। ও যদি কোনও খবর পায় বা বিপদে পড়ে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে, আমি আছি। আপনারা এই বিষয়টাকে নিয়ে ওর সঙ্গে আর কোনও কথা বলবেন না। ওকে আমি ফ্রি করে দিয়েছি। ও একদম স্বাভাবিক স্টুডেন্ট লাইফ কাটাক। আমি আপনাকে ডাকতাম না। কিন্তু আর্যই বলল—আপনি খুব টেনশন করছেন।

রিহার্সালে যাচ্ছেন না। আজ থেকেই সব ছেড়ে নতুন করে শুরু করুন। আর হ্যাঁ, ও ফেসবুক ওয়াটসঅ্যাপে একটু কম থাকবে। বাইরে ওকে প্রোটেকশন দেব আমরা। ও আমাদের নজরে থাকবে। ওকে মনে রাখতে হবে আগামী দু-তিন বছর আমরা ওকে নজরে রাখছি। সেটা ওর ভালোর জন্য। থ্যাঙ্কস।'

বাইরে বেরুতেই বিশ্বদীপ বলল, 'আর্য ভালো করে থাকিস। যে কোনও দরকারে ফোন করিস। তোর বাবার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকবে।' বিশ্বদীপ এমানুলের দিকে তাকাল, বলল, 'আর্য একে চিনিস?'

আর্য ঘাড় নাড়ল, না।

বিশ্বদীপ হাসল, 'তোর চেনার কথা নয়। বছর পাঁচ ছয় আগে ময়দান কাঁপাত। এর নাম এমানুল আকুয়া। দু-দুটো বড় ক্লাবের স্টার প্লেয়ার। এখন আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। বউ, দুটো মেয়ে, তারমধ্যে ছোট মেয়েটা অসুস্থ। বিদেশ বিভুঁয়ে কোনও কাজ নেই। কিন্তু ও এখানে থাকবে। নানা ধরনের ড্রাগসের বিজনেস করবে। গাঁজা বিক্রি করে। এর আগে একবার কোকেন, একবার হেরোইন নিয়ে ধরা পড়েছে। এবার থার্ড টাইম। প্রচুর কেমিক্যাল ড্রাগস নিয়ে ধরা পড়েছে। দেখে নে। কাল সব টিভি চ্যানেল দেখাবে, কাগজেও ছবি দেখবি। এখন জ্যান্ত দেখে নে। এটা তোর জন্য গিফট।'

আর্য নাইজেরিয়ান এমানুল আকুয়ার দিকে তাকায়।

বিশ্বদীপ বলে, যদি গাঁজা বিক্রি করত, ছাড় দিতাম। ওর সংসারের কথা ভেবে। খুব বড় বড় পার্টি আছে ওর হাতে। সন্ধে হলেই ওকে রুবি থেকে এসআরএফটিআইয়ের সামনে দেখতে পাবি। গাঁজার পুরিয়া বিক্রি করছে। এবার ও বড় দাঁও মারতে চেয়েছিল। ফলে ছ' বছর মিনিমাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওকে তিনটে স্কুলে ফুটবল কোচ করে পাঠিয়েছি। সব জায়গায় ও গোলমাল করে চলে এসেছে। খারাপ লাগছে, আমি ওকে অনেক বাঁচিয়েছি। আর পারলাম না।'

এমানুল মাথা নীচু করে। ওর চোখের গড়িয়ে আসা জল গালে।

বিষণ্ণ গলায় বিশ্বদীপ বলল, 'জানিস আর্য আমাদের ছোটবেলায় কলকাতা ময়দানে মজিদ বাসকার আর জামশিদ নাসিরি নামে দুজন ইরানি ফুটবলার এসেছিল। এদের মধ্যে অসাধারণ ছিল মজিদ। ছেলেবেলায় আমাদের স্বপ্নের ফুটবলার। আমরা সাতসকালবেলায় মজিদের প্র্যাকটিস দেখার জন্যও ভিড় করতাম। সারা কলকাতা শহর তখন মজিদের নামে পাগল। কিন্তু দুঃখের কথা কী জানিস—মজিদ কিন্তু বেশিদিন খেলতে পারল না, পারিবারিক হতাশায় ডুবে নেশার চক্করে পড়ে গেল। রীতিমতো অ্যাডিক্টেড। একসময় ওর বন্ধু ফুটবলার জামশিদ নাসিরি ওকে ইরানে পাঠিয়ে দেয়। যারা ফুটবল ভালোবাসতো তারা এখনও মজিদের নাম করে—

এই সব কথা কিন্তু এমানুল জানে। আর মজিদের সঙ্গে এমানুলের তফাত কোথায় জানিস? এমানুল কিন্তু নিজে এক ফোঁটাও নেশা করে না। ও নেশা করায়। তুমি নিজে মরবে না, অন্যকে মারবে। আচ্ছা বলো তো এমানুল—এত অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের মেরে তুমি নিজের মেয়েদুটোকে খাওয়াবে? বউকে খাওয়াবে? ওদের বাঁচাবে? তোমাকে

অনেক বুঝিয়েছি, আর নয়। তুমি আমাদের ঘরে আগুন দিচ্ছ, আমাদের ছেলেমেয়েদের মৃত্যুমুখে ঠেলছ। এই তুমি ফুটবলার। এই তুমি শিল্পী? না, আর তোমাকে ছেড়ে রাখা যায় না। আমার কী মনে হয় জানো, তোমার পাপে তোমার ছোটমেয়েটার ওই অবস্থা, মৃত্যুর দিন গুনছে। তুমি যত ভালোই খেলোয়াড় হও, খুব খারাপ মানুষ তুমি। খুব খারাপ বাবা! এই শহরের সবাই তোমাকে ঘেন্না করবে কাল থেকে—

অমিত্রসূদন দেখল এমানুল আকুয়া কাঁদছে।

ষোলো

এক বুক স্বস্তি আর এক বুক অস্থিরতা নিয়ে সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরল অমিত্রসূদন। মনে হচ্ছিল গা গরম। তবু বাড়ি ফিরে ভালো করে চান করল। শকুন্তলা ছটফট করছিল ওখানে কী হল শোনার জন্য। এসব কথা বলতে অমিত্রসূদনের ভালো লাগছিল না, ইচ্ছেও করছিল না। শকুন্তলা এক প্লেট চিঁড়ের পোলাও আর চা নিয়ে এল। বলল, 'ওখানে সব ভালোভাবে মিটে গেছে?'

ঘাড় নাড়ল অমিত্রসূদন। বলল, 'ফালতু হ্যারাসমেন্ট। ওর কয়েকজন বন্ধু এটা করতে পারে। কোনও রাগ থেকেই করেছে।'

শকুন্তলা বলল, 'কয়েকজন নয়, আমার মনে হয় এটা একজনই করেছে— ওই নীতিশ। ওদের পয়সার মা-বাপ নেই। টাকাও আছে আর রাগও আছে ওই নীতিশের।'

'এই নীতিশের সঙ্গে তো ও বিএমডব্লু, পোর্সে চড়ে ঘুরে বেড়াত।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই নীতিশেরই কাজ, পুলিশ একটু চেষ্টা করলেই ধরতে পারবে। কিন্তু দেখো ওর বাবার অনেক পয়সা আছে, ওদের গায়ে গন্ধ করবে না।'

অমিত্রসূদন বলল, 'পুলিশ প্রমাণ পেলে ওকেও ধরবে। এখনও কোনও প্রমাণ নেই।'

'সব প্রমাণ পাবে, ধরে পেটালেই বলে দেবে।'

'সন্দেহ করে পেটাবে? সন্দেহ তো আর্যকেও করেছে। ওকে যদি সন্দেহের বশে পেটাত তোমার ভালো লাগত?' অমিত্রসূদন কেটে কেটে কথাগুলো বলল।

'ওই তো! তোমার সঙ্গে আমার মতের মিলবে না। সন্দেহ করে তোমার ছেলেকে ডেকেছে, তোমার ঘর এসে চেক করে গেছে। ওকে ডেকেছে?'

'নীতিশ এখন প্যারিসে। হয়তো ফিরলে ডাকবে। আর একজন কী নাম বলল,— হিরন্ময়। একেও নজর রাখছে।'

'হিরন্ময়! ওর সঙ্গে আর্য মেশে নাকি। সে তো খুব বাজে ছেলে ওর মতো নোংরা ছেলে দুটো নেই। আর্যর সঙ্গে হিরন্ময়েরও বন্ধুত্ব আছে? না, তাহলে তোমার ছেলের পেটে আরও অনেক কথা আছে, যা বলেনি, চেপে গেছে, সাধে আমি ওকে বিশ্বাস করি না।'

'যদি পেটে কোনও কথা থাকে তো তা থাকতে দাও। সে কথা পেটেই মরে যাবে। আপাতত আমরা মুক্ত। আর টেনশন বাড়িও না।

একটু চুপ করে থাকল শকুন্তলা। তারপরই বলল, 'তুমি আর কাউকে কিছু বলতে যেও না। পাঁচ কান হলে তারা ঠিক ফিসফিস করে নানা কথা আলোচনা করবে।'

অমিত্রসূদন বলল, 'তোমার চিন্তা নেই, বলব না।'

‘চিন্তাটা আমার নয়, চিন্তাটা তোমার। আমাকে আর ক’জন চেনে?’

এমন সময় ওদের সামনে আর্যনীল এসে দাঁড়াল। ‘আমি একটু বেরুচ্ছি।’

‘কোথায় যাচ্ছিস?’ শকুন্তলা বলল।

‘তেমন কোথাও না। এখানেই থাকব। আশেপাশে কোথাও। মেট্রো স্টেশনের সামনে।’

‘তাড়াতাড়ি ফিরবি।’

আর্যনীল বেরিয়ে যাচ্ছিল, শকুন্তলা আবার তাকে ডাকল, বলল, ‘শোন, কাউকে কিছু বলতে যাবি না। তুই আবার পেটে কথা রাখতে পারিস না।’

আর্য অদ্ভুত চোখে ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।

অমিত্রসূদনের মনে হল আর্য যেন একটু ফুরফুরে। বেশ হালকা মেজাজে আছে। ফেরার সময় আজ আর কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনল না। বরং নিজের পছন্দমতো গান বাজাল গাড়িতে। একটু বেশ জোরেই বাজাল। ও যেমন করে, ঠিক তেমনই।

আর্য বেরিয়ে যেতে শকুন্তলা বলল, ‘এবার যদি একটু শোধরায়, বেশ বড় একটা ধাক্কা খেল।’

অমিত্রসূদন কথাটার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না।

শকুন্তলা বলল, ‘ভালোই হয়েছে। সব খারাপের একটা ভালো দিকও থাকে। এর পজেটিভ দিক কী জানো, আর্য আর ভবিষ্যতে ওসব রাস্তায় ভুলেও পা রাখবে না। ওদিকে পা বাড়ানোর আগে দুবার ভাববে। ভাববে কেউ না কেউ ওকে দেখছে।’

অমিত্রসূদনের বার বার মনে হচ্ছিল এমানুল আকুয়াকে বিশ্বদীপ দু-দুবার বাঁচিয়েছে। যে ফুটবল ওকে এত সম্মান দিল, সেই ফুটবলকে ও সম্মান করল না। তিন তিনটে স্কুলের ফুটবল কোচের চাকরি ও ছেড়ে দিল কেন? সত্যিই কী ওর আর কিছু করার ছিল না? না কি এটাই ওর স্বভাব, অল্পে আয়াসে বেশি রোজগার। দু-দিন আগে গাঁজা বিক্রি করছিল, সুযোগ পেয়ে এই শহরে ও কেমিক্যাল ড্রাগসের মতো মৃত্যুর শমন নিয়ে হাজির হচ্ছে। অথচ ওর কাছে আনন্দ দেওয়ার অনেক উপকরণ ছিল। এ শহর ওকে নিঃস্ব করেনি। দু-হাত ভরে দিয়েছে, বিনিময়ে এমানুল আকুয়া মৃত্যুর শমন লটকে দিচ্ছে এই শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে। ওকে কি বিশ্বদীপরা পারবে জেলে বন্দি করতে? নাকি আইন ওকে এই শহর, এই দেশ ছাড়া করবে? নাইজেরিয়াতে গিয়ে ও কী এই মৃত্যুর কারবারে মাতবে?

আচ্ছা ডিজে হংসরাজ? ও তো ওর প্রফেশনে যথেষ্ট নামী। যথেষ্ট রোজগার আছে। কানে হিরের দুল, গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে দামি ঘড়ি, সোনার রিস্টলেট, আংটি। মনে তো হয় না ডিজে হংসরাজ দুটো ভাতের জন্য এই মৃত্যু ব্যবসায় ফেঁসে গেছে।

অমিত্রসূদনের মনে হল, তার মাথার ভেতরটা কেমন ভারী হয়ে আসছে। ষাঁড়ের কুঁজের মতো তার মাথাটা যেন নীরেট, ভেতরে থরে থরে আঁধার জমে।

বাইরে বেরুল না অমিত্রসূদন। আজও রিহার্সাল থেকে ছুটি নিল। ফোন করেছিল গ্রুপে। বুধবার শো আছে। রমাপতি ওদিকটা ভালোই সামলাচ্ছে। গ্রুপে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে আছে যারা কোনও অভাবই বুঝতে দেয় না। যে কোনও অসুবিধেয় বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শকুন্তলা সেই সোমবার গল্ফগ্রিনে পিসিমাকে দেখে এসেছে, সারা সপ্তাহ যায়নি। সাড়ে ছ'টা নাগাদ বলল, তুমি তো বাড়ি থাকবে, আমি আধঘণ্টার জন্য পিসিমার কাছ থেকে ঘুরে আসি।'

শকুন্তলা চলে গেছে। অমিত্রসূদন আশ্চর্য হয়। পিসিমার দুই ছেলে ভারতের বাইরে, মেয়ে থাকে চেন্নাইয়ে। আজ তিন-চার বছর কারও দু-চারদিনের জন্যও সময় হয় না মাকে দেখতে আসার। শুধু নিয়ম করে টাকা পাঠিয়ে যায়। অথচ শকুন্তলা নিয়ম করে সপ্তাহে দুদিন তিনদিন পিসিমার কাছে যায়। ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে আসে। কিছুদিন আগে শকুন্তলা একটা অদ্ভুত কথা বলল—পিসিমা নাকি বছর দেড়েক আগেও দুই ছেলেকে চিঠি লিখেছেন, খামে ভরে স্ট্যাম্প লাগিয়েও পোস্ট করেননি। বেশ কিছু এমন চিঠি সেদিন শকুন্তলার হাতে পড়েছে। একটা পুরনো বইয়ের ভাঁজে ছিল। শকুন্তলা পিসিমাকে কেন চিঠিগুলো পোস্ট করেননি সে কথা জানতেও চেয়েছিল। পিসিমা উত্তরে নাকি নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়েছিল। এত নির্লিপ্ত কি হওয়া যায়?

অমিত্রসূদনের হঠাৎ মনে হল, এখন প্রায় আটটা, আচ্ছা ডিজে হংসরাজ কি কিছু জানাল? ও যদি কিছু না জানায়, সত্যি সত্যি আজ রাতটা হংসরাজের শেষ রাত নয় তো? অমিত্রসূদন কিন্তু আজ বিশ্বদীপের কঠিন মুখ দেখেছে। কথাগুলো বলার সময় বিশ্বদীপ মুখের কোনও মাংসপেশী একবিন্দু নড়ছিল না। চোখ দুটো কেমন স্থির হয়ে ছিল। বিচারকের মতো বিশ্বদীপ মৃত্যু পরোয়ানা পড়ছিল, আর ওরা জল্লাদের মতো কঠিন মুখে শুনছিল।

ডিজে হংসরাজ কী বলবে সব কথা! হংসরাজ যদি না জানে? সময় তো বড়ই অল্প, যদি মনস্থির করতে না পারে? ভাবে, বিশ্বদীপেরা তাকে চাপে রাখতে চাইছে। তার পেট থেকে কথা টেনে বের করতে চাইছে। হংসরাজ যদি ওদের সঙ্গে নার্ভের খেলা খেলতে যায়? তবে ভুল করে ফেলবে হংসরাজ।

অমিত্রসূদন যে মৃত্যুর ঘ্রাণ পেয়েছিল আজ!

অমিত্রসূদন ফোনের দিকে হাত বাড়ায়। পাগলের মতো আঙুল ছুঁইয়ে ফোন করে বিশ্বদীপকে।

হ্যালো বিশ্বদীপবাবু, আমি অমিত্রসূদন দাশগুপ্ত বলছি, আচ্ছা ডি জে হংসরাজ কি কিছু বলল?

সতেরো

মেট্রো স্টেশনে এক দঙ্গল বন্ধুদের সঙ্গে মেতেছিল আর্যনীল। ফিরছিল সেবন্তী। ওকে দেখে হাসল। আর্য এগিয়ে এল। সেবন্তী বলল, 'কী রে তোর খবর কী?'

ঠোঁট মোচড়াল আর্যনীল, 'তেমন খাস কিছু নেই।'

সেবন্তী বলল, 'আঙ্কেল আন্টি ভালো আছে?'

ঘাড় নাড়ল আর্য। 'বিন্দাস!'

'আঙ্কেলের নতুন নাটকটা দেখা হয়নি।'

'বুধবার শো আছে—মধুসূদন মঞ্চে।'

'আকাদেমিতে থাকলে বলিস তো।'

'আকাদেমিতে শোয়ের চান্স খুব কম। ওখানে সব দলদাসদের দলরা সুযোগ পায়।'

আর্যর কথা শুনে সেবন্তী হাসল, 'বাপরে! দলদাস? হেবি বাংলা দিচ্ছিস।'

'টিভি থেকে শিখেছি।'

'আন্টির সঙ্গে বাংলা পড়া নিয়ে আর ঝামেলা নেই বল।'

আর্য হাসে। 'তোমার আন্টির এখন নিত্যনতুন ইস্যুস, কোন দিকে যে কোন বল ফেলবে বুঝতে পারি না।'

আর্যর কথায় সেবন্তী হাসে, বলে, 'আর্য সেই মেয়েটার সঙ্গে এখনও তোর বন্ধুত্ব আছে?'

'না, মায়ের ভয়ে পালিয়ে গেছে। আমাকে দেখলে দূর থেকে হাত নেড়ে পালায়—ভাবে আমার পিছনে নির্ঘাত মা আছে।' কথাটা বলতে বলতে আর্য হাসতে থাকে।

সেবন্তী বলে, 'প্লিজ আর্য বল—আন্টিকে তুই সেদিন ঠিক কী বলেছিলি?'

আর্য হাসে, 'কী আবার বলব! ঠিক কথাই বলেছি—তোমার মতো মায়েদের জন্যই এখন ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করছে, মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করছে। ভালো হবে তোমার ঘরে এমন বউমা আসবে যে দেখবে সকালে উঠে দাড়ি শেভ করছে।'

'একটু বল বল, আন্টি শুনে কী করল।'

'হাঁ করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর গিয়ে বিছানায় ধপ করে শুয়ে পড়ল। বাবা ফিরতে আমার নামে লাগিয়েছিল নিশ্চিত, বাবা দেখলাম খুব হাসছে। বলল, সত্যিই তো ওর যদি একটা মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, মেট্রো স্টেশন থেকে এক রিকশয় ফেরে, তোমার আপত্তি কী? মায়ের আপত্তি ছিল, আমি তোকে স্কুল থেকে ফেরার রিকশ ভাড়া দিচ্ছি, আর সেই রিকশয় তুই একটা মেয়েকে নিয়ে আসছিস! মা ফালতু কেসটা দিচ্ছিল। দেখো, আমি আট টাকা দিচ্ছিলাম, আর ও আট টাকা দিচ্ছিল। ষোলো টাকা ওর বাড়ি পর্যন্ত রিকশ চলে যাচ্ছিল। আমার বাড়ি পর্যন্ত রিকশভাড়া দশ টাকা। তাহলে আমার দু টাকা লাভ। ওর লাভ বেশি আট টাকা। মায়ের সহ্য হল না। বলল, কেন তুই মেয়েদের সঙ্গে আসবি? একটা ছেলে এলে আমি কিছু বলতাম না। তাই জন্যেই বলেছিলাম, তোমার ছেলে-বউমা হবে।' আর্যর কথা শুনে সেবন্তী হাসিতে ফেটে পড়ে। বলে, 'জানিস এই গল্পটা আমি অফিসের কতজনকে করেছি। হিট স্টোরি।'

আর্য বলে, 'আজ একটা হিট স্টোরি দেব?'

'বল?'

'তোমার সোর্সের নাম জানাবে না তো?'

'না, বল।'

'তুমি এমানুল আকুয়ার নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ, কেন শুনব না—ফুটবলার। বড় ক্লাবের নামী ফুটবলার।'

'আচ্ছা তুমি ডি জে হংসরাজ বলে কোনও ডিজেকে চেনো?'

‘কী নাম বললি, ডি জে হংসরাজ? হংসরাজ চন্দর। আরে সে-ও নামী ডিজে, ব্লু সিটিতে আছে, কেন?’

‘শোনো, আজ দুপুরে লালবাজারের নারকোটিক্স সেল ওদের দুজনকে তুলেছে। ওদের কাছ থেকে প্রচুর এলএসডি, এমডিএমএ পেয়েছে।’

‘তুই ঠিক বলছিস?’

‘একদম কনর্ফাম খবর।’

‘দেখ, ভুল হলে কিন্তু আমাকে প্রচণ্ড খিস্তি খেতে হবে।’

‘আমি তো বলছি পাক্কা খবর।’

‘তুই কী করে জানলি?’

‘আমার এক বন্ধুর দাদা লালবাজারের নারকোটিক্সে আছে। সে আজ আমাদের বলেছে। কিন্তু এ-ও তোমায় বলছি, পুলিশ কিন্তু স্বীকার করবে না।’

সেবন্তী তার চ্যানেলে খবরটা দেওয়ার জন্য মঞ্জুভাষদাকে ফোন করতে করতে বলে, ‘পুলিশ স্বীকার করবে না কেন বল তো?’

আর্য প্রাজ্ঞ গলায় বলল, ‘আসলে পুলিশ চাইছে—ওদের দুজনের খবরটা গোপন রাখতে। গোপনে রেখে ওদেরকে সোর্স করে ড্রাগ পেডলারদের বড় বড় মাথাদের ধরতে। পুরো জালটা ওপেন করতে। ওদের দুজনের কাছে বড় বড় নাম আছে। এরা ধরা পড়েছে জানলে মাথাগুলো সতর্ক হয়ে যাবে।’

আর্যর কথা শুনে সেবন্তী কী যেন ভাবল। রিং হওয়া ফোনটা কেটে দিল। ফোন কেটে চুপ করে আর্যর দিকে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু ওদিকে চ্যানেল থেকে মঞ্জুভাষ ফোন করল। সেবন্তী ধরল। মঞ্জুভাষ বলল, তোর তো আজ ছুটি। তা ছুটির দিনে ফোন করে মরছিস কেন?

সেবন্তী বলল, ‘মঞ্জুভাষদা কাল তোমায় বলছিলাম না—গাঁজার হেবি দাম বেড়ে গেছে, এনসিবি আর লালবাজারের নারকোটিক্স সেল মারাত্মক ধরপাকড় করছে।’

‘হ্যাঁ, খবর পেয়েছি, ওরা পাগলা কুকুরের মতো ঘুরছে। কয়েকজন খ্যাপা অফিসার এসেছে, ওরা সারা কলকাতা জুড়ে ছানবিন করছে। কলকাতা শহরটা এখন হয়ে গেছে ট্রানজিট পয়েন্ট। এখান থেকে সারা ভারতে ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে, বাংলাদেশ যাচ্ছে। ইয়াবা, কেমিক্যাল ড্রাগ। যারা গাঁজা সাপ্লাই করত তারাই এখন এগুলোর দিকে ঝুঁকেছে। এতে লাভ বেশি। এই অফিসারদের টার্গেট ইয়াবা, কেমিক্যাল ড্রাগ। কিন্তু ওদের ধরপাকড়ে গাঁজা আটকে যাচ্ছে। গাঁজার দাম বেড়ে যাচ্ছে।’

‘মঞ্জুভাষদা আমি কাল থেকে স্কুল কলেজের ড্রাগ অ্যাডিক্টেড ছেলেমেয়েদের নিয়ে যদি স্টোরি করি—’

‘কর, কাল এসে কথা বল। আমি তোকে সোর্স দেব। তবে অফিসারদের গোপনে বলছি, গাঁজাটা একটু রিলিজ দিতে। গাঁজা বন্ধ হলে যারা শুকনো নেশা করে তারা অন্যদিকে ঝুঁকবে। ঠিক হ্যায়, কাল কথা হবে। গুড নাইট।’

আর্য ওদের কথোপকথন শুনে কিছুটা অবাক হয়ে বলল, ‘তুমি চ্যানেলে আমার হিট স্টোরিটা দিলে না?’

সেবন্তী বলল, 'না, দিলাম না। কেন দিলাম না জানিস? ওরা নিশ্চয়ই আজ রাত থেকে বা কাল থেকে ধরপাকড় শুরু করবে। ওরা গোপন করছে। আমি যদি এই খবরটা জানিয়ে দিই, তাহলে সমাজের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব। ওরা ভালো কাজ করছে, আমাদের উচিত ওদের সাহায্য করা।'

আর্য চুপ করে সেবন্তীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সেবন্তী বলল, 'বরং পরে তুই তোর বন্ধুর দাদার ফোন নম্বরটা আমাকে দিস। দেখি, আমি ওনার সঙ্গে কথা বলব। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের এইসব নেশা ধ্বংস করে দিচ্ছে।'

আর্যনীল শান্ত গলায় বলল, 'তুমি নারকোটিক্স নিয়ে কাজ করো সেবন্তীদি, আমি তোমাকে নারকোটিক্স সেলের অফিসারদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব। কাল সকালে ওদের একটু পারমিশন নিই।'

সেবন্তী বলল, 'ঠিক আছে রে, চলি।'

আর্য বলল, 'আমিও চলে যাই। চলো।'

সেবন্তী বলল, 'তাহলে চল হেঁটে যাই, আর রিকশ নেব না।'

দু'জনে হাঁটছে। আর্য বলল, 'কী আশ্চর্য না, আমাদের শিবঠাকুর রীতিমতো গাঁজা খেয়ে ব্যোম হয়ে থাকে। ধর্মটা কেমন গোলমেলে জিনিস, অথচ এই লোকটাকেই সবাই কত ভালোবাসে—দেবাদিদেব মহাদেব!'

সেবন্তী হাসে, 'সেই মহাদেবের ষাঁড় এখন আমাদের পাড়ায়, রোজ রাতে শো দেখাচ্ছে —'

'হ্যাঁ, ধর্মের ষাঁড়!'

'তুই কী শুনেছিস ওই ধর্মের ষাঁড় দারাসিংকে চিলিচিকেন খাইয়ে দেওয়ার কনস্পিরেসি হচ্ছে। ওর ধর্ম নষ্ট করে ওকে বধ করা হবে!'

হো হো করে দুজনেই হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে সেবন্তী বলে, 'ভাগ্যিস তোর সঙ্গে দেখা হল, কতদিন পরে একটু মন খুলে হাসলাম। এক বুড়ো উকিলের কাছে গিয়েছিলাম —মেয়েরা মা লক্ষ্মী, মা লক্ষ্মীর জাত। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে করে এত এত জ্ঞান দিল যে মাথার ভেতর ভোঁ ভোঁ করছে।'

'আজ তো তোমার ছুটি, উকিলের কাছে গিয়েছিলে কেন?'

'ডিভোর্স করব বলে। আর পারছি না। এবার বিদায় দেব। তার তোড়জোর করতে গিয়েছিলাম।'

আর্য চোখ কুঁচকে বলল, 'সত্যি বলছ?'

'একদম সত্যি।'

'জানো, আমাদের বন্ধুদের ব্রেকআপ হলে পার্টি দেয়।'

'এই আমার ব্রেকআপটা খুব চাপের। এটার জন্য পার্টি চাস না, বা খেতে চাস না। বিয়ের সময় যথেষ্ট খেয়েছিস। আর নয়।'

দু'জনে আবার হো হো করে হাসে। হাসতে হাসতে আর্য বলল, 'সেবন্তীদি সত্যি বলছ?'

‘এটা নিয়ে কেউ মজা করে? একদম সত্যি। আর ন্যাকামি করতে পারছি না, তাই শেষ করে দিলাম। ওই বুড়ো উকিলটা অনেক বোঝাল। ইয়াং উকিল হলে এত বোঝাত না। কাল নোটিশ চলে যাবে।’ সেবন্তী বলল, ‘দাঁড়া, এক প্যাকেট সিগারেট কিনি।’

‘পাড়ার দোকান থেকে কিনবে? তোমাকে নিয়ে কিন্তু খিল্লি করবে?’

‘মাই ফুট!’

আঠেরো

সেবন্তী কাল রাতে মরতে চেয়েছিল। কেন মরতে চেয়েছিল, সে কথা এখন ওর স্পষ্ট মনে নেই। তবে একদম যে মনে নেই সে-কথাও স্পষ্ট করে বলা যাবে না। ও মারা গেলে সবাই ভাবত, ওর মৃত্যুর কারণ রাঘব। একটি অসফল বিবাহিত জীবনে অনেক মানুষই এভাবে মৃত্যুকে বেছে নেয়, সেবন্তীও নিয়েছে। সবাই ওকে বোকা বলত, বলত এই সময়ে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে অসফল বিবাহিত জীবনের জন্য আত্মহননের পথ বেছে নিল, ছিঃ!

কারও ছিঃ বলাকে সেবন্তী পাত্তা দেয় না। এই ডোন্ট কেয়ার মনোভাবটা তার বাবা মা কেউই পছন্দ করে না। কিন্তু সে এভাবেই চলবে। রাঘবের সঙ্গে ওর কিছুতেই বনিবনা হচ্ছে না। রাঘব চায় এই চাকরিটা সেবন্তী ছেড়ে দিক। এই মধ্যরাতে বাড়ি ফেরা তার বাড়ির লোক মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু সেবন্তী এই চাকরিটা ছাড়বে না। কেন সে অন্য জব নেবে? রাঘব তো তাকে এভাবেই দেখেছে। এভাবে দেখেই পছন্দ করেছে।

সেবন্তী একটা চ্যানেলের ক্রাইম রিপোর্টার। আপাত দৃষ্টিতে তাকে সব সময়ই খুব হাসি খুশি লাগে। একদম বিন্দাস। কিন্তু এই অসফল বিবাহিত জীবনের জন্য তার ভেতর ভেতর অনেক অপমান জমে গেছে। তীব্র এক ক্ষোভ। যা সেবন্তী হজম করতে পারছে না। একটু ভাবলেই মাথা কেমন গুম মেরে যায়।

এই জমে যাওয়া অপমানটা সে মধ্যরাতে ধোঁয়া করে উড়িয়ে দেয়। পারে না। তবু দিতে চায়। নাহলে যে বাঁচবে না। তার অফিসের তারক তাকে রোজ দুটো গাঁজা ভরা সিগারেট এনে দেয়।

কিছুদিন আগে এক পুলিশ অফিসারের রেইড করা মাল থেকে কটা গাঁজাভরা সিগারেট পেয়েছিল। প্রথম প্রথম কুড়িয়ে বাড়িয়ে সেগুলো খেয়েছিল। এরপর তারক গাঁজাভরা সিগারেটের লোকজন আবিষ্কার করে। সেখান থেকেই কিনে আনে। কুড়ি কুড়ি চল্লিশ টাকা। সন্ধে হলেই সেবন্তী একটা সিগারেটে আগুন জ্বালায়, তবে তখন সে পুরো খায় না। কেননা মঞ্জুভাষদা দু-দুদিন তাকে ধমকেছে—এই মেয়ে তুই গাঁজা টেনে এসেছিস?

‘আমি গাঁজা! মঞ্জুভাষদা তুমি না কী যে আজে বাজে কথা বলো? যা মাইনে দাও তাতে বিড়িই জোটে না তো গাঁজা!’

মঞ্জুভাষ না তাকিয়ে বলে, ‘বিড়ি! ইদানীং তো শুনছি ঠোঁটে সব সময় সিগারেট ঝুলছে!’

‘কোন শালা খোঁচড়গিরি করছে আমাকে বল তো?’

ক'দিন আগে তারক বলে গেল, 'দিদি ছেলেগুলো আসছে না। খুব নাকি ধরপাকড় হচ্ছে।'

'ধড়পাকড়! এই তারক শোন—তুই হলি টিভি চ্যানেলের কলঙ্ক!'

তারক অবাক হয়ে বলল, 'কেন দিদি?'

'ধরপাকড় হলে আমরা তো খবর করতাম, তাই না? যা মঞ্জুভাষদাকে গিয়ে বল—দাদা খুব নাকি গাঁজা ধরছে, তা আমাদের খবর কোথায়?'

তারক বলল, 'সব খবর কী আমরা ব্রেক করি! দেখো গে দুম করে কেউ মেরে দেবে। তখন তারকের বাসি কথা দামি হবে।'

দু'দিন পরে তারক আবার গাঁজা ভরা সিগারেট এনে দিল। বলল, চল্লিশ নয়, দুটো পঞ্চাশ দিতে হবে। পঁচিশ করে। শালারা কিছুতেই দাম কমাল না। তাও বললাম, আমরা 'দুনিয়ার' স্টাফ। ওরা দুনিয়ার নামই শোনেনি, কী বলে জানো—কোন দুনিয়া? আমি বললাম—তোমরা কোন দুনিয়ায় থাকো, দুনিয়া টিভি! ওর বলল—পঁচিশ করেই দিতে হবে। এগুলো ভালো গাঁজা মণিপুরী মাল!'

সেবন্তী বলল, 'হ্যাঁ মণিপুরী! ভাগ্যিস বলেনি—হিমাচলের মালানা থেকে এনে দিচ্ছে!'

'মালানাতে হেবি গাঁজা পাওয়া যায়, না দিদি?' তারকের দু-চোখ চকচক করে ওঠে। ইদানীং তারক গাঁজা খাওয়া শিখেছে। সেবন্তী তার একটা সিগারেট সন্ধের মুখে চারটে পাঁচটা টান মেরে তারককে দেয়। তারক সেটা নিয়ে মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়। সেবন্তীদিকে সম্মান দেখায়। আসলে বিল্ডিং-এর বাইরে যে চায়ের দোকান আছে, সেখানে গিয়ে গুছিয়ে বসে সুখটান দিতে।

মাঝে একদিন রিনিঝিনি হাসতে হাসতে বলল, 'সেবন্তী তুই কিন্তু ওই কচি ছেলেটাকে নষ্ট করে দিলি। নিজে গাঁজায় দুটো টান মেরে ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে আসছিস!'

'দেখ বেচারা কিনে নিয়ে আসছে। ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে। এটুকু তো দিতে হবে।'

তারক ক্যামেরাম্যান। ভারী ক্যামেরা নিয়ে ভয়ঙ্কর জোরে দৌড়াতে পারে। দুরন্ত দুরন্ত সাহসী ছবির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু বেচারার কপাল খারাপ, কী করে যেন সব সময় ওর হাত কেঁপে যায়। ভালো ছবি হতে হতেও হয় না। তাই ইদানীং ওকে গৌরদা নিউজের ক্যামেরাম্যানের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে ফিচারে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখানে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছবি তুলতে হয় না। সাজানো গোছানো জিনিস, দাঁড় করিয়ে, বসিয়ে, দু-পা হাঁটুন, বলে ছবি করা যায়। তারক ক্রাইম রিপোর্টার সেবন্তীর প্রায় নিজস্ব ক্যামেরাম্যান। গায়ে অসুরের মতো শক্তি। চেহারা শিলের নোড়ার মতো। কিন্তু গাঁজা ভরা সিগারেট খেয়ে কেমন যেন ভ্যালভেলের মতো হয়ে যায়। কে বলবে এটাই সেই তার-কাটা-তারক। যাকে দিয়ে কোনও মশলাই বাটা যায় না।

রিনিঝিনি বলল, 'তার কাটার বউ যে দিন জানবে ওকে তুই গাঁজা খাওয়াচ্ছিস, গাঁজা কেস দিয়ে দেবে কিন্তু।'

সেবন্তী হাসে, 'কী করব বল, তোর মতো গৌরদার মুখে দুধ ধরাতে পারছি না।'

'দুর দুর, এই বুড়োগুলো দুধ দুধ করে হামলে পড়ে, কিন্তু খেলেই দেখি গ্যাস হচ্ছে বলে ছটফট করে!'

ওরা দুজনেই হেসে গড়িয়ে পড়ে।

সেবন্তীর মালানার কথায় তারক বলল, ‘মালানা তো হিমাচল প্রদেশে, না? আমাদের পাঠাতে পারে—হেবি ক্রাইম স্টোরি হবে?’

‘কেন ওখানে ক্রাইম স্টোরি পাব কেন? হিমাচল ছবির মতো সুন্দর জায়গা।’

‘না, অত নেশা যেখানে সেখানে তো ক্রাইম থাকবেই।’

সেবন্তী হাসে, ‘শোন ওসব জায়গায় ক্রাইম খুব কম হয়। ওখানে নেশাটা ভাত রুটির সঙ্গে জড়িয়ে। কেউ ক্রাইম করলে গ্রামেই বিচার হয়। পুলিশ বা পুলিশি দালালগুলো ঢুকতে পারে না। খুব দুর্গম জায়গা। ‘

কথাটা বলে সেবন্তী একটু চুপ করে যায়। বিয়ের পর সে রাঘবকে বলেছিল, ‘চল কসোলে হনিমুন করতে যাই।’

‘কসোল—হিমাচল প্রদেশ। কসোল বলছিস কেন? সিমলা কুলু মানালি বল!’

‘শোন সিমলা কুলু মানালি করতে গেলে পনেরো দিনের ছুটি চাই। অত ছুটি তুই পাবি? কসোল ওয়ান উইকে হয়ে যাবে।’

রাঘব একটু থমকে গিয়ে বলেছিল, ‘হিমাচল প্রদেশ যাব, সিমলা কুলু মানালি না গিয়ে কসোল!’

‘কসোল হল ভারতের ইজরায়েল! ইজরায়েল থেকে বিদেশিরা সব ওখানে বেড়াতে আসে। আমাদের হনিমুন ট্রিপটা ইজরায়েলে হল মনে কর না!’

রাঘব হেসেছিল, ‘ঠিক আছে দাঁড়া, টিকিট দেখি।’

সেবন্তী বলল, ‘তুই শুধু হ্যাঁ বল। তোকে কিছু করতে হবে না, আমি সব করে নেব।’

রাঘব ঘাড় নেড়েছিল। কিন্তু রাতেই রাঘব পরিষ্কার জানিয়ে দিল সে দুনিয়ার যেখানে খুশি যাবে, কিন্তু কসোল যাবে না। কারণ, রাঘবকে ওর অফিসের কেউ বলেছে, বউয়ের অফিস কি তোকে হনিমুন ট্রিপ গিফট করছে? রাঘব অবাক হয়ে বলেছিল, না তো। ওর অফিস ধুঁকছে, তারা দেবে হনিমুন ট্রিপের খরচ! সে বলেছিল, তবে কসোল কেন? ওটা তো ক্রিমিনালদের জায়গা। পৃথিবীর সব মাদক পাচারকারী, মাদকসেবীরা গরম পড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। নির্ঘাত তোর নতুন বউ তোকে নিয়ে খবর করতে যাচ্ছে। রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হল। কথাটা শুনে মটকা গরম হয়ে গেল রাঘবের। এসে বলল, ‘তোর নিউজের নেশাটা কমা।’

সেবন্তী অবাক হল, ‘নিউজের নেশা?’

‘হ্যাঁ নিউজের নেশা! তুই হনিমুন ট্রিপটাকে নিউজের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিস। আমি বুঝেছি, কসোল শুধু নয়, তোর টার্গেট মানালা। বল কসোল গেলে একবার তুই পার্বতী উপত্যকা যাওয়ার চেষ্টা করবি না, একবার তুই মানালা গ্রামে ঢোকার জন্য ঝাঁপাবি না? আমি মনে হয় তোর ভুল চয়েস, তোর কোনও নিউজম্যানকেই বিয়ে করার উচিত ছিল।’

সেবন্তী চুপ করেছিল, তার মনে হয়েছিল, রাঘবও তাকে একজন ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে দেখছে। কিন্তু সে খবর দেখতে চায়নি। সে জীবন দেখতে চেয়েছিল, এক

অন্যরকম আদিম জীবন।

হিমাচল প্রদেশের কুলু ভ্যালির তিনটি পাহাড়ের মাঝে এক গ্রাম মানালা। মানালা নালা। হিমালয়ের এথেন্স। এখানকার অধিবাসীরা তাই বলে। ওরা বিশ্বাস করে, ওরা দ্য গ্রেট আলেকজান্ডারের বংশধর। ওরা গ্রিক। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ আলেকজান্ডার ভারতে আসেন, এখানে থাকেন প্রায় ১৯ মাস। কথিত আছে, আলেকজান্ডার যুদ্ধ শেষে ফেরার সময় সব সৈন্যদের নিয়ে ফিরে যাননি। কিছু সৈন্যকে আদেশ করেন এখানে থেকে যেতে। সেই তারাই এখনকার মানালার অধিবাসী। তারা সেই গ্রিক জীবনচর্যায় এখনও বেঁচে থাকতে চায়। সারা পৃথিবী থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। ওদের ভাষা কানাসি। যে ভাষা পৃথিবীর আর কোথাও শোনা যায় না। ঐতিহাসিকরা বলেন, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশহাজার ফুট উঁচুতে এই গ্রামটি প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক গ্রাম। এদের দেবতা ঋষি জমলু। যিনি সর্বশক্তিমান। যার কোনও মূর্তি নেই। পুজোপাঠও নেই। আছে কিছু বাণী। সেই বাণীই ঘরে ঘরে টাঙানো থাকে।

মানালা যেতে জারি থেকে ট্যাক্সি নিতে হয়। অবশ্য ইচ্ছে করলেই এই গ্রামে ঢোকা যাবে না। গ্রামে ঢোকার আগেই চেক পোস্ট। সেনা কর্তৃপক্ষ জানতে চাইবে কেন এসেছেন এখানে। যুক্তিপূর্ণ উত্তর না হলে আটকে যেতে হবে। কিন্তু তার মধ্যেও সারা পৃথিবীর মাদক সম্রাটরা অনায়াসে এখানে ঢুকে পড়ে।

এখানকার ঘরে ঘরে কুটির শিল্পের মতো নেশার উপকরণ বানানো হয়। এরা শত শত বছর ধরে বংশ পরম্পরায় পপি আর ক্যানাবিস চাষ করছে।

এই গ্রামে পুলিশ ঢুকতে পারে না। কিন্তু সারা পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে এখানে মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ীরা হাজির হয়। সবাই বলে, এখানকার মতো ভালো আর দামি গাঁজা আর চরস পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না। এরা ওদের নিজস্ব ভাষা কানাসিতে কথা বলে, কারণ ওরা জানে ওরা নেশার জিনিস বিক্রি করে, যা বাইরের জগতের কাছে অপরাধ।

এখানে হাজির হওয়া মাদক কারবারীরা মনে করে, এদের কাছে গাঁজা থেকে নানান নেশার জিনিস বানানোর, বিশেষত চরস বানানোর গোপন রেসিপি আছে। যা ওরা বছরের পর বছর লুকিয়ে রেখেছে। কানাসি ভাষা ওদের আড়াল করে রেখেছে।

নব্বইয়ের দশকে একদল পর্যটক ওখানে যায়। তারা নাকি ওদেরকে জোরাজুরি করে চরসের গোপন ফর্মুলা জানতে। পরে সেই বারোজন পর্যটকের লাশ পাওয়া যায় পাশের পাহাড়ে। সবাই বলে ওরা মেরে ফেলে দিয়ে এসেছিল।

মালানা। মালানা নালা। হিমালয়ের এথেন্স।

কসোল ভারতের ইজরায়েল।

তারক হাসে, 'কী অদ্ভুত না! আমাদের এখানে গাঁজা দেখলে পুলিশ পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দেবে, মাথা পর্যন্ত কেস দিয়ে দেবে আর ওখানকার পাবলিক উঠোনে খেতে গাঁজা চাষ করছে। কী আশ্চর্য!'

তারককে আরও আরও আশ্চর্য করে দেওয়ার জন্য সেবন্তী বলল, 'যদি কোনওদিন চান্স পাই যাব। তোকে নিয়ে যাব। সত্যি সত্যি একটা স্টোরি করব। কী রে পারবি না?'

তারক বিড়বিড় করে 'পারব। পাহাড়ি পথ, চারদিকে ছবি আর ছবি, তাই না।'

তারক হাঁ করে সেবন্তীর কথা শোনে। তার বুক পকেটে একটা সিগারেট আছে। গাঁজা ভরা। নতুন ছেলেদুটো বলল, এ মাল এখানে প্রথম। খেলেই ধুম লেগে যাবে।

তারক খায়নি। আজ রাতে শোয়ার আগে উঠোনে দাঁড়িয়ে খাবে। খেয়ে স্বপ্ন দেখবে। পায়ে হেঁটে হেঁটে সে ছবি তুলছে, চারদিকে শুধু গাঁজার খেত। পপি আর ক্যানাবিস! গাঁজা আর গাঁজা! ওখানে কোনও পাপ নেই। তার হাত নড়ে গেলে, ক্যামেরার ছবি নড়ে গেলে কেউ তাকে খিস্তি করবে না। এখানকার যা খিস্তি, যা পাপ আছে তা সব ওই কানাসি ভাষার আড়ালে লুকিয়ে আছে। গোপন আছে। গোপন ফর্মুলা। জানতে চাইবে না। জানতে চাইলে মেরে লাশ ফেলে দেবে। ওরা গ্রিক। ওরা যোদ্ধার জাত। হাসিস খাইয়ে দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের ক্রুসেড লড়তে পাঠানো হয়েছিল। ওরা হাসিস খেয়েছিল, যাতে প্রতিপক্ষকে ওরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে পারে। তারকাটা তারকও গাঁজা ভরা সিগারেটে নরম করে হাত বোলাতে বোলাতে ক্রুসেড লড়ার জন্য তৈরি হয়। গৌরদা নিউজ থেকে তাকে সরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সেবন্তী মরল না কেন? মাঝে মাঝে ওর মাথার ভেতরটা গুম হয়ে যায়। মনে হয় চারপাশের সবাই যেন তরবারি খুলে এগিয়ে আসছে। ক্রুসেড লড়তে হবে তাকে। সে লড়বে না। এক মুঠো ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়বে। তার আগে সে বারান্দার দোলনায় বসে, গাঁজা ভরা সিগারেটে আগুন দেয়, হালকা সুখে টানে। দম ভরে টেনে নেয় বুকের ভেতর। ধোঁয়া ধোঁয়া! প্রাচীন সে গ্রাম। আলেকজান্ডার আর পুরু। মুখোমুখি। জীবন আর মরণ। মুখোমুখি। সেবন্তী গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ে বারান্দায়। আর সেই ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ঘোরে। জীবন আর মরণ। যুদ্ধ আর সন্ধি। আলেকজান্ডার আর পুরু। রাঘব আর সেবন্তী। সেবন্তী আর বাবা-মা।

দুলতে দুলতে কাল মধ্যরাতে সেবন্তী ঠিক করল—সে আর যুদ্ধ করবে না। সন্ধি করবে। ডিভোর্স ফাইল করবে। রাঘবকে বলবে, এসো। মিউচুয়াল ডিভোর্স।

জীবন মানেই তো গোপন ফর্মুলা! তার হাসি খুশি থাকার গোপন ফর্মুলা কাউকে জানাবে না। ঢেকে রাখবে কানাসি ভাষার আড়ালে। যদি কেউ সে ফর্মুলা চুরি করতে আসে, দুনিয়া টিভির ক্রাইম রিপোর্টার সেবন্তী তার লাশ ফেলে দেবে! আপাতত সে মরবে না, তার সব কষ্ট অপমান ক্ষোভ দেখো লাশ হয়ে পড়ে আছে পাশের পাহাড়ে।

উনিশ

বিশ্বদীপ আশ্চর্য হল, মানুষটা ডি জে হংসরাজের জন্য ফোন করেছে তাকে! বিশ্বদীপ ভালো করে শোনার জন্যই বলল, 'বলুন অমিত্রসূদনবাবু?'

প্রচণ্ড উদ্বেগ নিয়ে অমিত্রসূদন দাশগুপ্ত চাপা স্বরে বলল, 'ডি জে হংসরাজ কিছু বলল? শুনুন, ও যা জানে বলবে। আজ না বললেও কাল বলবে। কিন্তু ওকে মেরে ফেলবেন না দয়া করে।'

বিশ্বদীপের মাথার ভেতর দপ করে উঠল, বলল, 'এরপর নিশ্চয়ই এমানুল আকুয়ার জন্য বলবেন। ওকে জেলে না পাঠাতে। ওর মেয়ে অসুস্থ। ও পেটের জ্বালায় করেছে। আমি জানি, ডি জে হংসরাজ আপনার বন্ধু নয়। এমানুল আকুয়াও আপনার বন্ধু নয়। তবু

ওদের জন্য আপনার উদ্বেগ। যদি ওদের জেল হয়, যদি ওদের জিনিস ওদের খাইয়ে চিরতরে নেশার রঙিন স্বপ্নঘুমে পাঠিয়ে দিই। বড্ড চিন্তা আপনাদের!

বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোও বড্ড চিন্তা করেছিল। খুব হইচই করেছিল। হাসিনা সরকার মাদক বিরোধী অভিযানের জোর কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে কী হল, অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। কী জানেন অমিত্রসূদনবাবু আপনারা চিন্তা করেন, চিৎকার করেন, আর তার ফল খুব ভালো হয় না।

ডি জে হংসরাজকে আমি কী করে চিনি জানেন? ওর নামে একটা মেয়ে অভিযোগ করেছিল। একটা পার্টিতে হংসরাজের দেওয়া একটা কোল্ডড্রিঙ্ক খেয়েছিল মেয়েটা। তারপর তার কিছু মনে নেই তার সঙ্গে কী হয়েছিল— কী কী হয়েছিল। তবে সে তার শরীর দিয়ে বুঝেছিল একাধিকজন তাকে রেপ করেছে।

আমরা যা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ও আসলে একজন ড্রাগস পেডলার। ডিজের মুখোশটা সামনে রেখে ও ড্রাগস বিক্রি করে। ওর কারবার ডেট রেপ ড্রাগস নিয়ে। আপনার মনে নেই, বা থাকতেও পারে, কলকাতার এক বিউটি পার্লারের ভেতর একটা গণধর্ষণ হয়। সেখানে এই ডেট রেপ ড্রাগস ব্যবহার করা হয়েছিল। এই ড্রাগস সাধারণত তিন ধরনের হয়—রোহিপনল, কেটামাইন ও জিএইচবি। রোহিপনল জলে গুলে যায় সহজে, জলটা সামান্য নীল হয়। রোহিপনল কাজ করে ৩০ মিনিটের মধ্যে। তারপর পানীয়টি খাওয়ার পর আর কিচ্ছু মনে থাকে না। এই করে প্রচুর মেয়ে রেপ হচ্ছে পার্টিতে, বন্ধু বান্ধবদের বাড়িতে।

ঘটনাটি জানাজানি হয় এক বিউটি পার্লারের কেসে। কেটামাইন ঘোড়াকে ঘুম পাড়াতে ইউজ করা হয়। দিল্লির পার্টি প্ল্যানাররা এই কেটামাইন কিনছে দিল্লির চিড়িয়াখানার কিছু অসাধু কর্মীদের থেকে। এখন দিল্লি সহ সারা ভারতের পার্টিগুলোতে চড়া দামে বিকোচ্ছে। বড়লোকের নেশা। বিপদে পড়ছে অসংখ্য মেয়ে। দিল্লির অম্বিকা, ১৯ বছর বয়েস। একটা পার্টিতে গিয়ে নাচছিল। আলাপ হয়েছিল, আইটি সেক্টরে কাজ করা একটি ছেলের সঙ্গে। তার হাত থেকে ড্রিঙ্ক নিয়ে খেয়েছিল। তারপর আর তার কিছু মনে নেই। তাকে পাওয়া যায় সরকারি হাসপাতালে। গণধর্ষণ করে তাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল রাস্তার ধারে।

আপনার তো মেয়ে নেই অমিত্রবাবু, আপনি ঠিক বুঝবেন না, মেয়েদের জন্য এই ড্রাগস কী ভয়াবহ। এই রোহিপনল বা কেটামাইনে কত মেয়ের ক্ষতি হচ্ছে। যার সামান্য অংশ পুলিশের খাতায় নথিবদ্ধ হচ্ছে। ডি জে হংসরাজ এই ভিন্নধর্মী ড্রাগসের এক চেটিয়া ব্যবসা করে। হংসরাজদের মতো লোকগুলোকে খোলা জায়গায় ঘুরতে দেওয়া, সমাজে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। ওদের মৃত্যুদণ্ডই পাওয়া উচিত।

সমাজটা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আর এই বদলে যাওয়াটার সুযোগ নিয়ে হংসরাজ, এমানুল আকুয়ারা এক ভয়ঙ্কর খেলা খেলতে নেমেছে। এদের খোলা জায়গায় রাখা যাবে না। তাহলে কেউ আর সুরক্ষিত থাকবে না।

আপনি ভাবুন তো, হুগলির একটা ছেলে, যে কেমিক্যাল ড্রাগস নিত, তার পায়ের শিরাগুলো ফেটে ঘা হয়ে গেছে। সেখানে সাদা সাদা পোকা কিলবিল করছে। কিন্তু তাতেও তার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে এলএসডির নেশায় বুদ হয়ে রঙিন স্বপ্ন দেখছে। এরা সব লস্ট কেস, এদের নিয়ে ভাবছি না। আমরা ভাবছি আমার আপনার ঘরের আর্যদের মতো ছেলেদের নিয়ে। ভাবছি, আমাদের নিয়ে, ওরা যদি ভুল করে জড়িয়ে পড়ে আর ফিরে আসার পথ নেই। ভুল করে, বয়সের ধর্ম মেনে সহজাত কৌতূহলে

একবার ঢুকে পড়লে আর বেরুনোর চান্স নেই। কেমিক্যাল ড্রাগস ওদের মাথার ভেতরকার সব সিস্টেম ঘেঁটে দেবে। সব অনুভূতিকে নিজের মতো করে নিয়ে ট্রিগার করবে—চলো নেশা করি। নেশা চাই। আর তখন নেশার জন্য চুরি, ডাকাতি, খুন, শরীর বেচা সব সব তুচ্ছ! পৃথিবীর সব সম্পর্ক তুচ্ছ! জীবন ও মরণও তুচ্ছ হয়ে যাবে! শুনুন, একটা স্পষ্ট কথা আপনাকে বলি, আইন কানুন দিয়ে লড়ে যদি সাফ না করা যায়, মেরে সাফ করতে হবে—আমি এই বিশ্বাস করি।'

একনাগাড়ে কথা বলে বিশ্বদীপ থামল। অমিত্রসূদন নীচু গলায় বলল, 'আসলে ফিরে আসার পর থেকে আমার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আছে। তাই আমি আপনাকে ফোন করলাম।'

বিশ্বদীপ হাসল, 'ভালো করেছেন। আপনি ফোন করেছেন বলে, আমিও কিছু গরল ওগরাতে পারলাম। আপনার বুকের ভেতর ভারী হচ্ছে, আপনার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আর আমার বুকের ভেতর বিষ জমছে। এ বিষের রং নীল নয়, এর রং ধোঁয়া ধোঁয়া! কাল তো রবিবার, দুপুর দেড়টার সময় আপনি আসুন। হাজরা মোড়ে, বসুশ্রী সিনেমা হলের নীচে। ডি জে হংসরাজ ভালো আছে। ও অনেক কথা বলেছে। কাল হংসরাজ থাকবে আমাদের সঙ্গে। দেখুন না, আমরা কীভাবে কাজ করি।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে অমিত্রসূদন চুপ করে বসেছিল। নীচে ডোরবেল বাজল। তারপর দরজা খুলে গেল। অমিত্রসূদন বুঝল, শকুন্তলা ফিরল। ও বেল বাজিয়ে নিজেই দরজা খোলে, এ বাড়ির সবার কাছেই এক সেট চাবি আছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে আসতে শকুন্তলা বলল, 'এই দেখো কাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম! আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আমি দেখে বললাম, চলুন আমাদের বাড়ি। এক কাপ চা খেয়ে যাবেন। উনি বললেন, কাল সকালে আসব, ওনার সঙ্গে কথা আছে। আমি বললাম, এখনই চলুন—উনি বাড়িতে আছেন।

অমিত্রসূদন দেখল সামনে কবি শওকত হোসেন।

'আসুন, আসুন।'

শওকত হোসেন বললেন, 'এখানে বসব না, আপনার পড়ার ঘরে চলুন।'

ন'টাও বাজেনি ঘড়িতে। দুজনেই জমিয়ে বসল পড়ার ঘরে। শকুন্তলা ঢুকল রান্নাঘরে। একেবারে চা নিয়ে এসে বসবে।

কথা শুরু হয়েছে। কিন্তু কথাগুলো যেন বড্ড ছেঁড়া ছেঁড়া। দু'জনেই যেন কেমন অন্যমনস্ক। দু'জনেই যেন সুরে বাজছে না।

শকুন্তলা চা নিয়ে এল। চা নিয়ে বসল তিনজনে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শকুন্তলা বলল, 'দাদা আমি কী শুনলাম আপনি নাকি এ পাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?'

শওকত হোসেন ম্লান হাসলেন, 'হ্যাঁ চলে যাচ্ছি। আমি তো সেদিন দাদার সঙ্গে দেখা হতে জানালাম। পার্ক সার্কাসের দিকে একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। পুরনো ফ্ল্যাট। তিনটে বেডরুম আছে। দুটো টয়লেট। বারান্দাটা খুব বড়। সেকেন্ড ফ্লোর।'

'কিন্তু আপনি চলে গেলে, আমাদের তো মন খারাপ হবে। এত বছর তো আমরা পাশাপাশি আছি।'

‘তা আছি। কিন্তু আমার বড় ছেলে ঈশান খুব ঝামেলা করছে। ওর মনে হচ্ছে আমরা বেশিদিন এখানে থাকতে পারব না। আমাদের নিজেদের জায়গায় চলে যেতে হবে। তাই এখন থেকেই যাওয়া ভালো।’

‘নিজেদের জায়গা মানে! হঠাৎ ঈশানের কী পাগলামি হয়েছে?’ শকুন্তলা একটু বিরক্তিমাখা গলায় বলল।

‘নিজেদের জায়গা মানে মুসলিম মহল্লাগুলো। আমি যেমন ভাবছি, ও তেমন ভাবছে না। ওর ভেতর একটা বড় চেঞ্জ এসে যাচ্ছে। রোজ রোজ মন খারাপ করে থাকে। কিছুতেই আমি ওকে বুকে জড়াতে পারছি না। উলটে ও আমার বিশ্বাসটাও নড়বড়ে করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমার দিকে আঙুল তুলছে—’ কথা থামিয়ে বিষণ্নমুখে শওকত হোসেন থামে।

‘কেন? এমন তো হওয়ার কথা ছিল না?’ অমিত্রসূদন বলল।

‘তাই আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। নিজের বিশ্বাসে এখনও আমি স্থির। কিন্তু ও আর শুনতে চাইছে না। আসলে সেই ক্লাস এইট থেকে এক অদ্ভুত লড়াই লড়ে আসছে, যা আমি তেমন করে কোনওদিন গুরুত্ব দিইনি। ওর নাম ঈশান। ওর ক্লাসের কোনও ছেলে আবিষ্কার করে ওর নামের মানে—হিন্দু দেবতা, মহাদেব। তারপরই নিত্যদিন ওকে মানসিক নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে। এটা আমার জন্য হয়েছে। এই ভুল আমি করেছি!’

শকুন্তলা ফিসফিস করে, ‘নামে কী এসে যায়? ওকে বুঝতে হবে। আর একটা বছর তো স্কুল, তারপর স্কুল চেঞ্জ করিয়ে দেবেন।’

‘সেখানেও যদি ওর নাম নিয়ে সবার আপত্তি ওঠে?’

‘উঠবে তো উঠবে? ঈশানকে বলুন, কেউ কিছু বললে আমাকে নিয়ে যেতে। আমি গিয়ে কথা বলব।’ শকুন্তলা দাপটের সঙ্গে কথাগুলো বলে উঠল।

হাসল শওকত। ‘সে তো আমি গিয়েও বলেছি। কেউ থেমেছে, কেউ থামেনি। আসলে ও বড্ড এন্ট্রিভার্ট! কী জানি, এইটুকু বয়সেই ওর মানসিক নির্যাতনটা বড্ড বেশি হয়ে গেল। ঠিক সময়ে স্কুলটা পালটে দিলে বিষয়টা চাপা দেওয়া যেত। অথবা কোর্টে গিয়ে নামটা এফিডেভিট করে দিলে আর সমস্যা থাকত না।’

‘ওর তো ক্লাস টেন, এই বছরে মাধ্যমিক।’

‘হ্যাঁ তাতেই ও বড্ড খেপে গেছে। ও আর এখন খাতায় কলমে ঈশান নেই—আহসান হোসেন হয়েছে। ক’দিন আগেই কোর্ট থেকে করে নিয়েছি। এখন দৌড় ঝাঁপ করতে হচ্ছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে যাতে অ্যাডমিট কার্ডে নামটা ঠিক ঠিক থাকে।’

‘সে কী!’ শকুন্তলা আঁতকে ওঠে। অমিত্রসূদন মাথা নীচু করে বসে।

‘আমি ওকে বোঝাতে পারি না, এটা আমার দেশ। আমাদের দেশ। বর্ধমানের আদি বাসিন্দা আমরা। এখনও দেশের বাড়ি আছে। পূর্ববাংলা বা পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্কই নেই। আমরা একদম এদেশী। ঘটি। কিন্তু ও যেন এমন এক মানুষ যার কোনও দেশ নেই, যে অদ্ভুত একটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। খুব খুব ক্ষতি হচ্ছে পড়াশোনায়।’

‘কত ছেলে তো কতরকম হয়ে যায়। ওকে চোখে চোখে রাখবেন দাদা। এই তো বাগুইআটির একটা ছেলে সিরিয়ায় চলে গিয়েছে—তাকে নিয়ে খবরের কাগজে কত

লেখালিখি হল না?’

‘সাইকিয়াট্রিস্ট দেখছে। বিষাদ ওকে গ্রাস করছে। ওর মা বলল, ক’দিন নাকি খুব মসজিদে যাচ্ছিল, সেখানে গিয়েও ও শান্তি পাচ্ছে না। জানেন ওর ডায়েরির সামনের পাতায় লেখা—কেন এলাম? আমি জানি না ও কাকে এই প্রশ্ন করছে? আমাকে? আমার কাছে তার একশো উত্তর আছে। কিন্তু ও আমাকে ঠিক ভরসা করতে পারছে না। বাবাকে যে সন্তান ভরসা করতে পারে না, তার বাবার মতো অভাগা আর কেউ নেই। ও আর নিজেকে মানুষ বলে চিহ্নিত করতে পারছে না, অন্যের দেখানো মতো ও একজন মুসলমান। আমি ওকে বোঝাতে পারছি না।’

‘ও এত ধর্মের দিকে ঝুঁকছে কেন?’ শকুন্তলা বলল।

‘ওকে যে ধর্মই আঘাত করছে। অনবরত করে চলেছে। খুব খারাপ আছি দাদা, যেভাবেই হোক আমাকে ঈশানকে বাঁচাতে হবে। ওর চারপাশে ধর্মের নেশায় বুঁদ হওয়া কিছু মানুষজন। ও ভালোটা আর দেখতে পাচ্ছে না। জানি না, ও যদি নিজে এবার ধর্মের নেশায় ডুবে যায়, আমি কী করে ওকে উদ্ধার করব। ধর্মের নেশা যে আফিমের থেকেও ভয়ানক!’

অমিত্রসূদনের মন ভালো নেই, কথা বলতে, সান্ত্বনা দিতে আর তেমন ইচ্ছে করছে না। সে শুধু কবি শওকত হোসেনের কথার প্রতিধ্বনি করল ধর্মের নেশা আফিমের থেকেও ভয়ানক!

কুড়ি

রাত ঠিক বারোটার সময় ষাঁড়টা এ-পাড়ায় আসে। ওর সময়জ্ঞান মারাত্মক টনটনে।

সময়টা নভেম্বরের শুরু। বাতাসে হালকা শীত শীত ভাব। কিন্তু বাইরে অসহ্য মশা। তাই বেশিক্ষণ জানলা খুলে রাখা যাবে না। এদিককার মশা বেশ বড়। অনেকটা ষাঁড়টারই মতো। আর মশার সুর মিঠে নয়, তারা ষাঁড়ের মতোই গর্জন করে ঘুরে বেড়ায়। তাদের চড়িয়ে মারলে, বোঝা যায় বেশ বড় শরীর। কেননা মারার পরই হাতের চেটোয় ঝুলের মতো অনেকটা কালো কিছু লেগে থাকে।

ঈশানী জানলা খুলে ষাঁড় দেখবে বলে দাঁড়িয়েছিল। তখনই একটা বেয়াড়া মশা বড্ড, ডিসটার্ব করছিল। চটাস করে ঈশানী চড় কষায়। পরক্ষণেই হাতটা দেখে সে ‘ইস’ করে আঁতকে ওঠে। ওর ‘চড়ের শব্দ’ আর ‘ইস’ করে ওঠা আওয়াজ ষাঁড়ের ফোঁত ফোঁত শ্বাসের সঙ্গে মিশে গেল।

নাহলে ওদিকে বারান্দায় যে ছেলেটা ঈশানীদের বারান্দার দিকে তাকিয়েছিল সে ঠিক শুনতে পেত। সে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে তিনটের শ্বাসের শব্দ পায়। ছেলেটার নাম শোভন। শোভনসুন্দর। ছেলেটার নামের পিছনের ‘সুন্দর’টা নিয়ে ঈশানীরা তিনজনেই কদিন আগে খুব খিল্লি করেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসিতে ফেটে পড়েছিল। এ খবর শোভনের কাছেও গেছে। কিন্তু সে-ও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। সে জানলা খুলেই এই ফ্ল্যাটের জিওগ্রাফি মাপে।

তিনদিকের তিন ফ্ল্যাটবাড়ির মাঝে এসে ষাঁড়টা দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত সে পাথরের মূর্তি হয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে। হয়তো একদিন এই তিন রাস্তার মোড়ে তার স্ট্যাচু হবে। গোরু মাতা, সে পিতা! মাতাহীন পিতা বড্ড একা! মানছি সবাই তাকে খাতির যত্ন করে।

সকালের দিকটা বাজারে যেকোনও দোকানের সামনে দাঁড়ালেই যে যা পারে দেয়। এ ব্যাপারে তার কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু ইদানীং তার চাহিদা একটু অন্য দিকে ধাবিত। শুধু পেটের জন্য নয়, আরও কিছু চাই। সে বড্ড একা।

ইদানীং উত্তমের হুঙ্কার, বউয়ের চিৎকার, মেয়ের কান্না সব ষাঁড়ের গর্জনের নিচে চাপা পড়ে গেছে। কেননা বারোটা বাজলে ষাঁড়টার গররর গররর ফোঁত ফোঁতে সারা পাড়া বেশ জমজমাট হয়ে যায়। রাত বারোটায় উত্তম এখন বড় ম্লান।

এতদিন দারাসিংকে দেখে তেমন কেউ ভয় পেত না। তবে সমীহ করত। কারণ যতই হোক ষাঁড় তো। ষাঁড়ের ষাঁড়ামো কখন শুরু হবে কে বলতে পারে। তখন এই এলাকার অবাঙালিরা বিশেষ বিশেষ দিনে ছোলা গুড় কলা খাওয়াত হাতে ধরে। এখন তারা দূর থেকে ছুঁড়ে দেয়। তবে তারা দারাসিংকে অহেতুক ভয় পায়। কারণ, দারাসিং আজ পর্যন্ত কোনও মানুষকে অ্যাটাক করেনি। ওর যত আক্রমণ গাড়ি। সে চলন্ত হতে পারে, আবার থেমে থাকা গাড়িও হতে পারে।

অবাঙালি আগরওয়াল আর তার স্ত্রী দারাসিংকে খুব মান্য করে। ওরা জানে ও মানে এই ষাঁড় সাক্ষাৎ দেওতা। ধরম কা ষাঁড়! তবে চারদিকে খবর আছে ধর্মের ষাঁড় বলে নাকি করপোরেশন ওকে তুলছে না। পাতি ষাঁড় হলে করপোরেশন কবে এটাকে তুলে বাঘের খাঁচায় চালান করে দিত। তবে মাতালের দলবল ইদানীং রাতে হইচই উল্লাস করে না। কারণ তাদের আর ষাঁড়ের সব কীর্তিকলাপ রাতে। দারাসিং-এর ষাঁড়ামো শুরু হয় রাত বারোটায়। হুট করে যদি বেশি খেপে দারাসিং অ্যাটাক করে।

দারাসিং আগে এমন খেপা ছিল না। রাতে ভিতে কখন এ পাড়ায় আসত কেউ টের পেত না। এখন আসার আগেই কনসার্ট বাজাতে শুরু করে।

দারাসিং এতক্ষণে এসে তিন ফ্ল্যাটের মাঝে পজিশন নিয়েছে। এখান দিয়ে এখন বাইক টাইক গেলে দারাসিং ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে, কিন্তু তেমন কোনও মুভ করবে না। তবে যদি হেড লাইট জ্বালিয়ে কোনও গাড়ি আসে তবে দারাসিং রুখে দাঁড়াবে। গর্জন করে বলবে, ‘থামো, এটা এখন আমার স্ট্যাচু হওয়ার স্থান! আমাকে স্যালুট করো!’

ডাঃ যোগেশ সেনের ছেলে পাপু আর মেয়ে গুডি রাত বারোটার অনেক আগে থেকেই মোবাইল হাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। না, দারাসিংয়ের তেমন ভালো ছবি পাওয়া যায় না। আলো নাহলে ছবি হয়? ভিডিও হয়। ফ্ল্যাশ মারলে দারাসিং মুখ তুলে তাকায়। দারাসিং বোঝে সে এখন হিরো হিরালাল! পাপুর খুব ইচ্ছে ছিল দারাসিংয়ের সঙ্গে একদিন সেল্ফি তুলবে। কিন্তু যোগেশ ডাক্তার বলেছে, ষাঁড়ের গুঁতোয় বোন ফ্র্যাকচার, স্টমাক, লাং ফুটো হয়ে যেতে পারে। হেড ইনজুরি কেসও নর্থবেঙ্গলে পেয়েছে।

দারাসিংয়ের গায়ের রংটা ছাই ছাই। দিনের বেলা তেমনই লাগে। কিন্তু রাতের বেলা সেটা বেশ ঘোর হয়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ! দারাসিং হয়তো ভাবে তার স্ট্যাচু হবে দুধ সাদা। অমাবস্যার রাতের দেখা যাবে আর পূর্ণিমার জ্যোৎস্নামাখা রাতে সে চিকচিকে হয়ে স্নান করবে। তবে স্ট্যাচুর জায়গাটা ঠিক এইখানে। এখন যেখানে সে দাঁড়িয়ে ওদিকে রাখা গাড়িটা দেখছে।

এই ফ্ল্যাটে ঈশানীর সঙ্গে আরও দুটি মেয়ে থাকে। রম্যাণী আর রূপমায়া। এই ফ্ল্যাটের বাদবাকি দুজন রূপমায়াকে মায়াবিনী বলে ডাকে। মায়াবিনী প্রচণ্ড সাজে। চোখের পাতা থেকে পায়ের নখ, নানারকম রঙে খোলতাই। রূপমায়া এখন পায়ের নখে হাফ হাফ রঙিন করছিল। তার মধ্যেই বলল, কী রে কী হল?

শোভনসুন্দর আজ নির্বিকারভাবে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিন এসময় সে এখানে দাঁড়ালে সবাই ভেবে নিত সে ওই মেয়েগুলোকে দেখছে। আসলে ওর ঘরের সোজাসুজি ওই ফ্ল্যাটটা। সে জানলা খুলে বা না খুলে সিক্সটিন বি'র ওই ফ্ল্যাটটা পুরো দেখতে পায়। ওই ফ্ল্যাটটির মালিক মল্লিকবাবু একবার এসে হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল—আপনার ছেলে সারাক্ষণ আমার ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওখানে আমি পেয়িং গেস্ট রেখেছি। সব মেয়ে। শোভনের মা বলেছিল—ওগুলো মেয়ে! সব তো দেখি গোঁফ কামানো ব্যাটাছেলে! সারাক্ষণ হাফ প্যান্ট পরে বারান্দায় সিগারেট ফুঁকছে। বিষয়টা এখানে ধামাচাপা পড়েছিল। কিন্তু আগুন জ্বলছিল ধিক ধিক করে। ঈশানীরাও জেনে গেছে তারা হল গোঁফ কামানো ব্যাটাছেলে। তার হাফ প্যান্ট পরে। তারা সিগারেট খায়।

তিন তিনটে ফ্ল্যাটবাড়িকে সাক্ষী রেখে দারাসিং এবার অ্যাকশনে নামল। তার শিং দিয়ে প্রথমে রাস্তায় দাঁড় করানো একটা গাড়িকে বার সাতেক ঢুঁসো মারল। গাড়িটা থরথর করে কাঁপছে। যেন যে-কোনও সময় গাড়িটা উলটে যাবে।

কে যে ওখানে আজ গাড়িটা রাখল? গাড়ি রাখার আর জায়গা পায় না? গ্যারেজ কিনতে পারে না সব গাড়ি কিনে বসে।

জানলায়, বারান্দায় নানারকম কথা চলে। ইশ যা গাড়িটার নম্বর প্লেট বেঁকে গেল! আরে বাম্পারটার একদিকে ডেবে গেছে।

শিবনাথের স্ত্রী প্রমীলা বলল, 'পুলিশকে খবর দেওয়া উচিত, পাড়ার ভেতর এমন গুন্ডামি বরদাস্ত করা উচিত নয়।'

শিবনাথ সংশোধন করিয়ে দিল, 'পুলিশ নয় করপোরেশনকে খবর দিতে হবে।'

কিন্তু দেবেটা কে?

তারপর দারাসিং তার বাঁকানো শিংটা গুঁজে দিল গাড়ির পিছনে বাম্পারের দিকে। যাদের গাড়ি নেই তারা অনেকেই এটা দেখে মজা পেল। আবার যাদের গাড়ি, এবং মাস গেলে টাকা দিয়ে সে গাড়ি গ্যারাজে রাখে তারাও মজা পেল ভিন্ন কারণে। কারণ, গাড়ি কিনেছে, অথচ গ্যারাজ কেনেনি।

তবে কেউ কেউ হায় হায় করে উঠল। যারা রাস্তার ওপর গাড়ি রাখে। কেউ কেউ নীচে নেমে এসে গেটের মুখে তৈরি হয়ে আছে। হাতি তাড়ানোর হুলাপার্টির মতো টিন পিটিয়ে ষাঁড় তাড়াবে। কেউ কেউ চকোলেট বোম জোগাড় করে রেখেছে। তবে আবার মনে ভয়ও আছে, মধ্যরাতে সবার সামনে চকোলেট বোম ফাটালে নির্ঘাত পুলিশি ঝামেলায় জড়াবে।

প্রমীলা বাইরের তর্জন গর্জনের ভেতরই 'উঃ আঃ উঃ আঃ' করছে। চাপা গলায় শিবনাথ বলল, 'আস্তে!'

শিবনাথ উত্তেজনায় মুখভরা একরাশ টুথপেস্টের ফেনা নিজের বুকের ওপর উগরে দিল।

ডাঃ যোগেশ সেন ছেলেদের বলল, 'আমি কনর্ফাম দারাসিংকে সিওর কোনও গাড়ি ধাক্কা মেরেছে। তাই গাড়ির ওপর দারাসিংয়ের এত রাগ।'

রূপমায়া বলল, 'ওরে ঈশানী জানলায় কি সুন্দর-ষাঁড়টা এল?'

উত্তম নেশার ঘোরে বলল, 'এটা ভদ্রলোকের পাড়া, রাতবিরেতে এটা কী হচ্ছে!'

কেউ একজন বিড়বিড় করল, 'করপোরেশন তো শুনেছি ষাঁড়ের পিছনের একটা পায়ে ইঞ্জেকশন করে অকেজো করে দেয়। তাতে ওদের হুজ্জতি কমে।'

রূপমায়া বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে। বলল, 'আমার একটা ষাঁড় চাই! ষাঁড়! দারাসিংয়ের মতো!'

এখন রাত সাড়ে বারোটা। ডাঃ যোগেশ সেন মোবাইলটা মিউট মুডে করে একটু পর্ন ভিডিও চালিয়ে আরাম করে বসল।

তারা দুটো ছেলেই তখন মগ্ন স্পেনের বুল ফাইটের গল্পে।

উত্তম মদে ঘুমে উলটে।

ঈশানী ফেসবুকে গিয়ে শোভনসুন্দরের ছবি দেখছিল। একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট কি পাঠাবে?

প্রমীলা সামনে বসে পরিশ্রান্ত মেয়ের খাওয়া দেখছিল। মেয়েটার জন্য তার বড় কষ্ট!

বারান্দায় অমিত্রসূদন শকুন্তলা নেই। আর্যর জানলায় আজ আলো নেই। এখন কোথাও দারাসিং নেই। তবে শিং আছে। উঁচিয়ে আছে। কোথাও না কোথাও আছে। অমরেন্দ্র ভট্টাচার্যর মায়ের মনে থাকতে পারে, পাপ! পাপ! এভাবেই সব শেষ হবে। শিবনাথের মনে থাকতে পারে। উত্তমের আতঙ্কে থাকতে পারে, মানুষটার কত শত্রু। আর রূপমায়া স্বপ্নে।

রূপমায়া আজ সারা রাত একটা ষাঁড়ের স্বপ্ন দেখবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিড়বিড় করবে—দারাসিং! দারাসিং!

একুশ

দেড়টার সময় বসুশ্রী সিনেমা হলের সামনে।

এমনটাই বলেছিল বিশ্বদীপ। খুব জড়তা নিয়ে হাজির হয়েছিল অমিত্রসূদন। কাল রাত থেকেই বার বার ভেবেছে তার কি যাওয়া উচিত? একবার ভেবেছিল বলে দেবে, সে যাবে না। কিন্তু পরক্ষণে মনে হল, সে যাবে। তবে কেন যাবে, কীসের জন্য যাবে, সে জানে না। একটা পনেরোতেই পৌঁছে গিয়েছিল অমিত্রসূদন। সে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা স্করপিও থেকে বেরিয়ে এল দেবেশ ঘোষ। সামনে এসে বলল, 'স্যার আমায় চিনতে পারছেন? আমি আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম।'

অমিত্রসূদন একটু হতচকিত হয়ে গেল। সে ঘাড় নেড়ে হাসার চেষ্টা করল। পারল না। বলল, 'বিশ্বদীপবাবু এসেছেন?'

'উনি আসবেন না। তবে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। হয় ফোনে, নয় ফিজিক্যালি কোথাও না কোথাও আছেন। ঠিক সময়মতো জানিয়ে দেবেন। আসুন আমরা গাড়িতে বসি।'

গাড়ির ভেতর আরও জনা পাঁচেক ছেলে বসে। তাদের মধ্যে একজন ডি জে হংসরাজ। হংসরাজ ফোনে কথা বলছে। কাল ওর ফোন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। হংসরাজ বলল, 'স্যার রনি আমাকে আড়াইটের সময় অ্যাক্রোপলিসের সামনে আসতে বলল।'

'ঠিক আছে। রনি মাল নিয়ে আসছে বলল?'

'হ্যাঁ তাই তো বলল। আমি বলে দিয়েছি। টাকা রেডি।'

দেবেশ বলল, 'কত টাকার মাল আসছে—দশ লাখ?'

'হ্যাঁ, দশ লাখ।'

'কী আছে?'

'বলছে তো লিকুইড এলএসডি, এমডিএমএ, আর ডেট পার্টি ড্রাগ।'

'গুড। আর কোকেন?'

'না ও কোকেন দিতে পারবে না। কোকেনের কারবার করছে না।'

দেবেশ ফোন করে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজার সামনে একজন এসে টোকা দেয়। দরজা খুলতে দেখা গেল দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। খুব সাধারণ চেহারা। একজনের মাথা জোড়া টাক, অন্যজনের চোখে অদ্ভুত একটা সানগ্লাস। দেবেশ বলল, 'এই গাড়িতে আমরা পাঁচজন থাকব। আমাদের গাড়ি থাকবে অ্যাক্রোপলিসের উলটো দিকে। আমরা শেষে যাব। প্রথম যাবে লালবাবুদের গাড়ি। গাড়ি নিয়ে আপনারা সোজা চলে যাবেন। অ্যাক্রোপলিসের পাশের রাস্তায় গাড়ি রেখে আপনারা মেন গেটের কাছে হংসরাজের গাড়ির অপেক্ষায় থাকবেন। ওর গাড়ি ওখানে ভিড়লেই আপনারা চারপাশে যে যার মতো পজিশন নিয়ে রাখবেন।

গড়িয়াহাটে হংসরাজ গাড়ি চেঞ্জ করবে। ও আমাদের গাড়ি থেকে নেমে নিজের গাড়িতে উঠবে। একদম একা। হংসরাজ নিজের গাড়ি ড্রাইভ করে অ্যাক্রোপলিস যাবে। একা। এর মধ্যে যদি রনি জায়গা পালটায় আমি সবাইকে জানিয়ে দেব।'

অমিত্রসূদন নিথর হয়ে বসে।

দেবেশ বলল, 'হংসরাজকে ঘিরে সবাই ফলো করবে। পয়েন্ট ওয়ান, হংসরাজ তুমি চালাকির চেষ্টা করবে না। গাড়ি হাতে পেয়ে ভেগে যাওয়ার চেষ্টা করলে ঠকবে। কেননা আমাদের গাড়ি ছাড়াও আরও দুটো গাড়ি তোমাকে ফলো করবে। পালানোর সবদিকই তোমার জন্য আমরা ব্লক করে রেখেছি। তুমি কোনওভাবেই পালাতে পারবে না। চালাকির চেষ্টা করো না, করলে মরবে, আজ রাতই তোমার শেষ রাত হবে।

পয়েন্ট টু, অ্যাক্রোপলিস মল থেকে একটু এগিয়ে বাস স্টপের কাছাকাছি তুমি গাড়ি রাখবে। ওটা নো পার্কিং জোন। সার্জেন ডিসটার্ব করতে পারে। সে নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। লালবাবুদের কেউ আগে গিয়ে সার্জেনের সঙ্গে কথা বলে নেবে। তোমাকে ধরবে না। গাড়ি রেখে হংসরাজ রনির সঙ্গে যোগাযোগ করবে। জানিয়ে দেবে তুমি এসে গেছ। সঙ্গে অনেকগুলো টাকা একটু তাড়াতাড়ি এসো। ক্লাবে যেতে হবে বলে তাড়া দেবে।'

হংসরাজ বলল, 'হ্যাঁ ওকে তাড়া দিতেই হবে। ও যদি নেশা করে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে আবার কাল দুপুরে। বারো চোদ্দো ঘণ্টা তো ঘুমাবেই।'

দেবেশ বলল, 'ওর সঙ্গে কথা বলার সময় জানিয়ে দেবে গাড়ির ভেতর টাকার ব্যাগ আছে—এতগুলো টাকা। গাড়িতে এসে টাকা দেখে নাও, আমিও মাল দেখে নেব। ওকে গাড়ির ভেতর তুলে গাড়ির আলো জ্বালাবে। ওটাই সিগন্যাল। যদি মাল না নিয়ে আসে, তুমিও টাকার ব্যাগ খুলতে দেবে না। বরং যদি বলে অন্য কোথাও চলো—তুমি সেদিকেই গাড়ি চালাবে। শুধু একটু সময় নিয়ে গাড়িটা এগোনোর বদলে একটু পিছবে। মানে ব্যাক গিয়ার দেবে।

ঠিক আছে। চলো আমরা রওনা দিই। গড়িয়াহাট থেকে তুমি তোমার গাড়ি নিজে চালিয়ে যাবে। সব গাড়ি থেকে পুলিশের বোর্ড খুলে দেবেন। আমরা গড়িয়াহাট থেকেই সবাই আলাদা। যা যোগাযোগ তা ফোনে।'

যাত্রা শুরু হল।

গড়িয়াহাট পার হয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। হংসরাজ নেমে নিজের গাড়িতে গেল। আর ওর গাড়ির চালক এ-গাড়িতে এসে উঠল। দেবেশ বলল, 'লালবাবুদের গাড়ি বেরিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ ওরা এতক্ষণে পৌঁছে পজিশন নিয়ে নিয়েছে।'

স্করপিও চলল খুবই শান্তভাবে। অ্যাক্রোপলিস মল দেখা যেতেই অমিত্রসূদনের বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটছে। ওদের গাড়ি অ্যাক্রোপলিস মল ছাড়িয়ে চলে গেল। তারপর ইউ টার্ন নিয়ে মলের উলটো দিকে দাঁড়াল। দেবেশ বলল, 'আমি আর অমিত্রবাবু গাড়িতে বসে আছি। তোরা নেমে যা। ওই দেখ হংসরাজ মলের গেটের সামনে, ওর গাড়ি লাগানো আছে বাসস্টপের সামনে। তোরা যে যার মতো পজিশন নিয়ে রাখ। একসঙ্গে যাস না। একজন একজন করে রাস্তা পার হয়ে যা।'

গাড়ি থেকে আরও তিনজন খুব আস্তে আস্তে এক এক করে নেমে গেল। ঘড়িতে দুটো পঁচিশ। আড়াইটের সময় রনির আসার কথা। দেবেশ বলল, 'অমিত্রবাবু আপনি কি হংসরাজকে দেখতে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।' অমিত্রসূদন মৃদুস্বরে বলল।

'আমরা কাল ওকে ওর গাড়িসুদ্ধ তুলে এনেছিলাম। ডিজের সঙ্গে ও পার্টি অর্গানাইজ করে। পার্টি প্ল্যানার। মূলত রেভ পার্টি। খুব ক্লোজড ডোর, ক্লোজড ফ্রেন্ডরা সব আসে। বড়লোকের ছেলেমেয়েরা দেদার নেশা করে। রাত থেকে পার্টি শুরু হয় ওদের বুকিং থাকে পরের দিন দুপুর পর্যন্ত। কেন না কেউ কেউ নেশা করে ওখানেই পড়ে থাকবে। দুপুরবেলায় তাদের নেশা কাটবে। এই পার্টিগুলোতে নানা ধরনের ড্রাগস চলে আর চলে ডেট রেপ ড্রাগস। তা জোগান দেয় এই হংসরাজ। এখানে এসে অনেক মেয়ের ক্ষতি হয়। রেপ হয়। এদের ন্যুড ছবি তোলা হয়। সেই ছবি দেখিয়ে কাউকে কাউকে পরে ব্ল্যাকমেল করা হয়। এসবের পুরো মাথা হল হংসরাজ।

ওকে আমরা কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। কোনও প্রমাণ পাচ্ছিলাম না। ওর কাছে সাদা সাদা তোয়ালে থাকে। সেই তোয়ালেগুলো সাধারণ তোয়ালে নয়। জি কেটামাইন ইঞ্জেকশনকে জলে ৩০ মিনিট ধরে একটা স্টিলের পাত্রে ফোটায়। ফোটালে জিনিসটি ঘন হয়ে যায়। তখন সেটা একটা তোয়ালের ধারে স্প্রে করে রাখে। সেই ধরনের তোয়ালে আসে ডিজে হংসরাজের কাছে। ভাবতে পারেন, সারা ঘরে আপনি নেশার কিছু পাবেন না। অথচ কেটামাইনের মতো বিষাক্ত কেমিক্যাল ড্রাগস সবার চোখের সামনে আড়ালে থেকে যাচ্ছে। এই ধরনের জিনিসের কারবার করে হংসরাজ।

ওর অনেক উঁচু মহল পর্যন্ত কানেকশন। এই যে আমরা ওকে প্রমাণ সহ ধরে নিয়েছি, ওর উঁচুমহল কিন্তু আর ওকে চিনতে পারবে না। কেননা ও ওপেন হয়ে গেল। ওর সব কানেকশন কেটে গেল। এরপর ওর বড় ক্লাব পাওয়া কঠিন। ওর কোনও পার্টিতেও ছেলেমেয়েরা আসবে না। তখন ও অচ্ছুত। কিন্তু ওকে বাইরে রাখা যাবে না। ওর অন্তত পাঁচ থেকে ছ' বছরের জেল হবে। হংসরাজের গল্প শেষ। ওর কাছ থেকে কলকাতার কোন কোন ডিজে ড্রাগস নিত সব হদিশ আমরা পেয়েছি। সেটার কাজ আজ রাত থেকে শুরু হবে, নয়া অভিযান। কলকাতার নাইট ক্লাবগুলোর অন্তত আটজন ডিজেকে তুলব। সবাইকে এই হংসরাজই ডাকবে। একেবারে জাল কেটে দেব। তার আগে আমাদের টার্গেট এই দশ লাখের কেসটা। এটা বড় টার্গেট। দশ লক্ষ টাকার মাল আসার কথা। নতুন ছেলে। নাম রনি। প্রথম এর নাম আমাদের কাছে এল। তাই একে তুলে নেব আগে।'

দেবেশের মোবাইল আলো জ্বলে কেটে গেল। দেবেশ বলল, 'অমিত্রবাবু দেখুন পাখি এসে গেছে ফাঁদে। দেখুন, ওর কাঁধে একটা ব্যাগ আছে। ওর কথামতো ওর কাছে দশ লক্ষ টাকার কেমিক্যাল ড্রাগ আছে।'

ঘড়িতে দুটো চল্লিশ।

অমিত্রসূদন দেখল, একটা রোগা লম্বা মতো ছেলে হংসরাজের সঙ্গে কথা বলছে। ছেলেটার কাঁধে একটা ল্যাপটপ ব্যাগ। পরনে জিনস, আর ফুলস্লিভ টিশার্ট, পায়ে স্নিকার। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে হংসরাজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। আর ওদেরকে ঘিরে পাঁচ সাতজনের একটা অদৃশ্য বলয়, যা কেউ না দেখলেও অমিত্রসূদন দেখল।

গাড়ির ভেতর হংসরাজ আর রনি উঠল। দেবেশ বলল, 'গাড়ি স্টার্ট দাও। এগিয়ে চলো।' কয়েক মুহূর্তেই গাড়ির আলো জ্বলে উঠল। আলো জ্বলতেই, অমিত্রসূদন দেখল, হংসরাজের গাড়ির সমস্ত দরজা আটকে অন্য অন্য লোক। ড্রাইভারের দরজা খুলে একজন ঢুকে পড়ল গাড়ির ভেতর। দেবেশ গাড়ির ড্রাইভারকে বলল চলো।

মুহূর্তে ওদের গাড়ি বাঁক ঘুরে এসে দাঁড়াল হংসরাজের গাড়ির সামনে। ফোনে দেবেশ বলল, 'এখানে এক্সচেঞ্জ করব না। আমাকে ফলো করুন। রুবি পার হয়ে ওকে নেব। হাত বেঁধে দিন। মুখের ভেতরটা দেখে নিন, কোনও ব্লেড বা ড্রাগস অ্যাম্পুল আছে কিনা।'

'চেক করেছি। কোনও কিছু নেই স্যার।'

'গাড়িতে পুলিশের বোর্ড লাগিয়ে দিন।'

গাড়ি ছুটছে। রুবি পার হয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা ফাঁকা জায়গায়। দেবেশ বলল, 'রনি আর হংসরাজকে আমাদের গাড়িতে তুলে দিন। শক্ত করে ধরবেন।'

দুটো গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়াল। স্করপিওর পেছনের দরজা খুলে গেল। আর তখনই গাড়ির পিছনে উঠে এল হংসরাজ আর রনি। ওদের পিছন পিছন আরও দুজন উঠে গাড়িতে বসল।

দেবেশ অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকল ছেলেটার দিকে। এই রনি! তখন গাড়ির পিছনের দরজার সামনে জনা চারকে দাঁড়িয়ে, একজন বলল, 'স্যার ওর কাছে দুটো ফোন ছিল। পার্স। আর এই ব্যাগটা—ব্যাগে ঠাসা মাল।'

দেবেশ রনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা রাখুন। কিন্তু এ কাকে ধরেছেন আপনারা?'

‘কেন স্যার রনি?’

দেবেশ বলল, ‘তোর নাম কী?’

‘রনি।’

‘ভালো নাম কী?’

‘রণিত রায়।’

‘তুই রনি নোস। তোর নাম রণিত রায় নয়। তোর নাম কণিষ্ক। কণিষ্ক চ্যাটার্জি।’

‘না, আমার নাম রনি। রণিত রায়।’

দেবেশ ঠান্ডা গলায় বলল, ‘বাইপাসের রাস্তায় তোকে আমরা গাড়ির দরজা খুলে ঠেলে দেবো। আর পিছনে আমাদেরই কোনও গাড়ি তোকে উড়িয়ে দেবে। বল, তখন কে মরবে রনি, না কণিষ্ক চ্যাটার্জি।’

দেবেশ বলল, ‘এই শম্ভু ওর পার্সে দেখ তো কোনও কাগজপত্র আছে কিনা? কোনও নাম ঠিকানা?’

‘না, স্যার কোনও কাগজপত্র নেই। শুধু ৬ হাজার টাকা আছে। আর এই কার্ডটা।’

দেবেশ হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নেয়। মণিকুন্তলা চ্যাটার্জি। যোধপুর পার্ক। দেবেশ বলল, ‘এটা কার কার্ড?’

‘আমার এক পরিচিতজনের মায়ের স্যার। ওনার ছেলের খবর দিয়ে যাব।’

‘কী খবর?’

‘ওনার ছেলে মারা গেছে, তাই।’

‘উনি তোকে চেনেন?’

‘আমার সঙ্গে ওনার কথা হয়নি। উনি আমাকে চিনতে পারবেন না। আপনি ফোন করে নিন। ওনার ছেলে হিমাচলে থাকে।’

‘কেন চিনতে পারবেন না। উনিও তোকে চিনতে পারবেন তুই কণিষ্ক চ্যাটার্জি।’

‘আমি রনি স্যার।’

‘না, তুই কণিষ্ক। তোকে ধরতে আমরা হিমাচলে কসোলে গিয়েছিলাম। কিন্তু টিপ ভুল ছিল। বা তুই জানতে পেরেছিলি, পালিয়ে যাস।’

‘আপনি ভুল করছেন স্যার। আমি রণিত রায়।’

দেবেশ বলল, ‘হংসরাজ এর নাম কী?’

‘রণিত, রনি। আমি তো তাই জানি।’

‘এ কোথায় থাকে?’

‘তা জানি না। তবে আমাকে যে মাল দেয় সে হিমাচল থেকে আসে। প্রত্যেক বছর কিছুদিনের জন্য কলকাতায় আসে। এ বছর সে এল না। এর কন্টাক্ট দিল। আমি কোনওদিন এর কাছ থেকে মাল নিইনি। আমাকে যে দেয়, সে এর কথা বলেছে।’

‘তুই কোথায় থাকিস?’

‘হিমাচলে স্যার। ওখানেই একটা রিসর্টে কাজ করি। আমি কেরিয়ার স্যার।’

‘মালিক কে?’

‘জি বি। জি বি-র কাছ থেকেই রাজদা মাল নিত। ও এবার নিজে আসেনি। আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছে।’

‘কলকাতায় তোর কে আছে?’

‘আমি ফ্রিস্কুল স্ট্রিটের একটা হোটেলে উঠেছি স্যার। হোটেলে আমার আইডি জমা দেওয়া আছে। দেখে নেবেন।’

‘তুই তাহলে কণিষ্ক চ্যাটার্জি নোস?’

‘না স্যার।’

‘হিমাচলে কলকাতার ছেলে কণিষ্ক চ্যাটার্জিকে চিনিস?’

‘চিনতাম স্যার? কিন্তু সে আর নেই। মারা গেছে।’

‘তোরও তো চেহারার যা অবস্থা বেশিদিন বাঁচবি না, মরে যাবি।’

‘আমার কেউ নেই স্যার। মরে গেলে কারও আসবে যাবে না।’

‘তোকে এখানে কে চেনে?’

‘কেউ না স্যার।’

‘কেউ চেনে না!’

রনি বলল, ‘একটু জল খাব স্যার।’

জল এল। জল খেয়ে রনি বলল, ‘সত্যি কথা বলব স্যার, আপনি ঠিক বলেছেন এটা কণিষ্কর মায়ের কার্ড। আমি এই কাজটা সেরে ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতাম। বন্ধুর মা। কণিষ্কের মৃত্যুর খবরটা দিয়ে যাব।’

দেবেশ বলল, ‘কণিষ্ক মারা গেছে!’

‘হ্যাঁ স্যার। আপনি খোঁজ লাগান।’

‘ওক্কে। ওর মৃত্যুর খবর জেনে যাব, তার আগে তোর খবর আর একটু জেনেনি।’

দেবেশ ওর মোবাইলে রনির মুখের একটা ফোটো তুলল। ‘মণিকুন্তলা চ্যাটার্জির একটাই নম্বর যখন নিশ্চয়ই ওয়াটসঅ্যাপও আছে। আমি তোর ছবি পাঠাচ্ছি মণিকুন্তলা চ্যাটার্জির কাছে।’

‘প্লিজ পাঠাবেন না স্যার। উনি আমায় চেনেন না।’

দেবেশ কার্ড দেখে দেখে ওর ফোনে নম্বরটা টাইপ করে—নাইন ফোর থ্রি থ্রি এইট...।

‘প্লিজ স্যার, আমি বলছি। পাঠিয়ে লাভ হবে না। ওনার ছেলে মারা গেছে। আর ওনাকে ডিসটার্ব করবেন না।’

‘উনি তোকে চেনেন। আমার মন বলছে। দেখা যাক।’

রনি মাথা নীচু করে। ‘মা জানে না স্যার, আমি কলকাতায় এসেছি। হ্যাঁ স্যার আমি কণিষ্ক। কণিষ্ক চট্টোপাধ্যায়।’

দেবেশ হাসে। 'লাইনে আয় বাপ!' দেবেশ সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোরা খুব বড় মাছ ধরে ফেলেছিস রে, গ্রেট! কণিষ্ক যদি চম্বলের ডাকাত হতো ওর মাথার দাম এক কোটি টাকা হতো। গ্রেট জব। উফ! স্যারকে একটা ফোন করি।'

হংসরাজ অবাক হয়ে তাকিয়েছিল দেবেশের দিকে।

দেবেশ ভিডিও কল করল বিশ্বদীপকে। 'স্যার, আমরা কণিষ্ককে পেয়েছি। সেই হিমাচলপ্রদেশ—।'

বিশ্বদীপ বলল, 'ও কবে কলকাতায় এসেছে? ডিটেলস নাও। তোমরা এসো।'

'কবে এসেছিস?'

'পাঁচদিন হয়ে গেছে স্যার।'

'কোথায় কোথায় মাল দিয়েছিস?'

'যারা মাল পেয়ে গেছে তাদের কথা জেনে আপনার কোনও লাভ নেই স্যার। তাদের আমি চিনি না। তারাও আমায় চেনে না।'

'এবার কত মাল এনেছিলি?'

'এটা লাস্ট ডেলিভারি ছিল। পুরো দশ লাখ টাকার মাল আছে।'

'কলকাতার বাজারে কত টাকা এর থেকে উঠবে?'

'কম করে ত্রিশ।'

'কলকাতা ছেড়েছিস কবে?'

কণিষ্ক হাসল, 'সাত বছর হয়ে গেল। সাত বছর পরে স্যার কলকাতায় এলাম। প্রচুর ফ্লাইওভার হয়েছে। বড্ড ভিড়। কিলবিল করছে মানুষ। পোকার মতো।'

'কসোলেই থাকিস?'

'হ্যাঁ ওখানে একটা রিসর্ট লিজে নিয়েছি। কলকাতার প্রচুর ছেলে ওখানে নেশা করতে যায় স্যার। ওরা সব রেনকোট পরে গাঁজা খেতের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যায়। আর ওদের রেনকোটে আঠা লেগে লেগে সাদা হয়ে যায়। সেই আঠা ছুরি দিয়ে চেঁচে নিয়ে দুরন্ত নেশা হয় স্যার। একদম প্রাকৃতিক নেশা। ওরা খুব মজা পায় স্যার। এটা কসোল ছাড়া অন্য কোথাও পাবেন না। কসোল ছাড়া এই মজা কেউ আপনাকে দিতে পারবে না। কসোল হল ইন্ডিয়ার ইজরায়েল। আপনারা তো ওখানে ঢুকতেই পারেননি স্যার। শুধু চারপাশে চক্কর কেটেছেন। আমার সঙ্গে কোনওদিন যাবেন—গাঁজা খেত দেখাব। এক সে বড় কর এক গাঁজা মিলবে স্যার ওখানে।'

দেবেশ বলল, 'তুই কী কী নেশা করিস?'

'আমি স্যার কেমিক্যাল নিই না। আমি গাঁজাই প্রেফার করি।'

'দিনে কটা?'

'সাতটা। আটটা হয়। বন্ধু-বান্ধব থাকলে বেশিও হতে পারে।'

'মরে যাবি।'

'যতদিন বাঁচব স্যার রাজার মতো বাঁচব।'

চুপ করে থাকল দেবেশ। একটু থেমে বলল, 'জানিস, আমরা ঠিক করে রেখেছি, তোদের মতো পেডলারদের ধরলে আইন আদালত করব না। মেরে দেব।'

'এ তো কমন কথা বললেন স্যার। আমি এখানে আসার আগে শুনছিলাম, আপনারা নাকি মেরে ফেলে দেওয়ার কথা-টথা বলছেন।' কণিষ্ক হাসল, 'আপনারা হুমকি দিচ্ছেন, ভয় দেখাচ্ছেন। যা খবর পেয়েছি, একরকম ভয়েই আপনারা কাজ সারছেন। ভালো স্যার। তবে আপনাদের আমি হুমকি দেব না, শুধু বলব—আর বেশিদিন নেই, আপনারা সব ট্রান্সফার হয়ে যাবেন। আপনাদের পুরো টিমটা ভেঙে যাবে স্যার। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ট্রান্সফার হয়ে কে কোথায় যে যাবেন!'

দেবেশ শীতল কঠিন গলায় বলল, 'ভয় দেখাচ্ছিস, কিন্তু আজ রাতটা তো আছি। এই রাতটাই তো তুই পার করতে পারবি না। আজই তোকে মেরে দেব। আর যে ক'দিন আছি তোদের সাফ করে যাব বলে ঠিক করেছি। তোদের জন্য বছরে কত ছেলেমেয়ে মারা যায় জানিস? কত ছেলেমেয়ে জীবন থেকে হারিয়ে যায়?'

'জানি না স্যার। তবে প্রচুর মানুষ আনন্দ পায়—এটা জানি। আমি চাই সবাই আনন্দে থাকুক। বিন্দাস থাকুক।'

'তুই আজ ক'টা নিয়েছিস?'

'দুটো।'

'তোর শেষ আনন্দ হয়ে গেছে। এই বিকেলটাই হয়তো তোর জীবনের শেষ বিকেল। শেষ সূর্য ডোবা দেখে নিস।'

'হতে পারে স্যার, আমার আনন্দের কোটা আমি পূর্ণ করে নিয়েছি। মা জানুক আমি হিমাচলে আছি। কসোলে বিন্দাস আছি। আমার মারা যাওয়ার খবর পেলে মানুষটা খুব কষ্ট পাবে। আর একটা কথা বলি স্যার, আমাকে বেওয়ারিশ লাশ করে দেবেন স্যার। মায়ের কাছে পাঠাবেন না। মাকে আর দুঃখ দিতে চাই না।'

পিং করে দেবেশের মোবাইলে একটা মেসেজ এল। দেবেশ মোবাইলটা তুলে দেখল। ওর মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল।

অমিত্রসূদনের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সে কোনওক্রমে বলল, 'দেবেশবাবু আমাকে সামনের সিগন্যালে নামিয়ে দেবেন।'

'লালবাজার যাবেন না? স্যার কিন্তু ডিপার্টমেন্টেই আছেন।'

'আজ আর যাব না। সামনের সিগন্যালেই আমি নেমে যাব।'

সামনের সিগন্যালে গাড়ি থামল। অমিত্রসূদন নেমে লম্বা করে শ্বাস নিল। ওর সঙ্গেই গাড়ি থেকে নেমে এল দেবেশ ঘোষ। বলল, 'আমি জানি আমার কথা শুনতে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আপনি ছটফট করছিলেন। যদি কোনওদিন আমাদের নিয়ে নাটক করেন, নিশ্চিত আমাদের মৃত্যুদূত বানাবেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমরা মৃত্যুদূত নই। মৃত্যুদূত এরা। আর মৃত্যুবাণ? ইরানের একটি জাহাজ আবুধাবী হয়ে কানাডা যাবে। তাতে ছিল তিন হাজার দেড়শো কেজি হেরোইন। সমুদ্র পথে দেড় দিন চেজ করে ইন্ডিয়ান কোস্টাল গার্ডরা তাদের ধরে। বলা হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ড্রাগস কনসাইনমেন্ট এটা। এই কনসাইনমেন্টের মাথা কে ছিল জানেন—এই কলকাতার এন্টালির একটি ছেলে। তার লক্ষ্য কানাডা নয়, ইন্ডিয়া। এখানে সে বেশি দাম পাবে। হাটে বাজারে মুড়ি মুড়কির মতো

ড্রাগস বিক্রি হবে। আপনার বা আপনার ছেলের হাতের সাদা তোয়ালেটাও আর নিরাপদ নয়! একটু দাঁড়ান—আপনাকে একটা জিনিস দেখাই।'

দেবেশ তার হাতের মোবাইলটা টিপল। বলল, 'আমি তখন কণিষ্কের মা মণিকুন্তলা চ্যাটার্জিকে ছবিটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম ছবিটি কার? একটা উত্তর এসেছে দেখুন।

মণিকুন্তলা চ্যাটার্জি উনি লিখেছেন

এটি আমার মৃত ছেলে কণিষ্ক চট্টোপাধ্যায়ের ছবি! অনুগ্রহ করে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।

অমিত্রসূদন হাঁটছে।

জায়গাটা কোথায় সে যেন ঠিক চিনতে পারছে না! হয়তো চেনার চেষ্টা করছে না। হ্যাঁ, এই শহর। কলকাতা শহরই তো। তাই তো হওয়ার কথা। তবু যেন অচেনা! শহরের ভেতর অন্য কোনও শহর। তার দু'চোখের কোটরের কালো বরফের মতো অন্ধকার আর খ্যাপা ষাঁড়ের গোঙানির মতো মৃত্যুধ্বনির শেষ শ্বাস!

বাইশ

সারারাত ঘুম হয়নি অমিত্রসূদনের। তার মাথার ভেতরটা অ্যাসফল্টের ওপর টায়ারের তীব্র ঘর্ষণের শব্দে ফেটে যাচ্ছে। বিশাল বড় বড় আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি আলোকমালায় সেজে। হু-হু করে ছুটে চলা একটা শহর, ঝকঝকে চকচকে, কী ভয়ঙ্কর আলোর তীব্রতা। সাদা আলো, লাল আলো, নীল আলো, ফিনকি দিয়ে উঠছে। রাত নেই, দিন নেই, শুধু আলো আর আলো।

এত আলো আর আলোয় তার ঘুম এল না। কেন ঘুম হয়নি, সে তো মুক্ত। তার সন্তান আর্যনীল দাশগুপ্ত সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত। তবে?

কিন্তু তার পরেও কি আর্য ভালো থাকবে? তার কি কখনও মনে হবে না, তার স্বাধীনতা নেই, কেউ তাকে দেখছে, কেউ তার দিকে নজর রাখছে? ওরা কি আর্যকে ক্রীতদাস হওয়ার শর্তে মুক্তি দিল? কী বলেছে আর্যকে—এই আমার কার্ড, আমার পারসোনাল ফোন নম্বর। কোথাও কিছু দেখলে আমাকে খবর দিবি। তোর কোনও ভয় নেই। আমরা আছি!

আর্য ভয় পাবে কেন?

বরং শকুন্তলা মনে করে, এতে ভালোই হয়েছে, তার পরিবারের, আর্যর ভালো হয়েছে। আর্য যেটুকু বিগড়েছিল, তার জন্য যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছে, এবার এ ছেলে লাইনে আসবে। কারণ আর্য জেনে গেছে তাকে কেউ দেখছে। সে আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে

পারবে না। তাকে কেউ লক্ষ্য রাখছে। শকুন্তলা মা হয়ে এতদিন ছেলেকে যে সবক শেখাতে পারেনি, সেটাই পুলিশ এসে ক'দিনেই শিখিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু অমিত্রসূদন কি তেমন করে ভাবছে?

সেদিন লালবাজার থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি আসার সময় তার মনে হয়েছিল, সে পিতা! জন্মদাতা পিতা! সে ছেলের জন্য সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে। কখনও সে ভেঙে পড়েনি। কখনও সে পিছু হটেনি। একজন পিতা এরচেয়ে আর কী করতে পারে? কিন্তু অমিত্রসূদনের বার বার মনে হচ্ছে, সে শুধু জটিল এক ধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। যেভাবেই হোক সে ছেলেকে মুক্ত করার কথাই ভেবেছে। আচ্ছা, ক্রিমিনাল ল'ইয়ার সৌম্যশংকর লাহিড়ী কি ঠিক কথা বলেছেন,—সে সম্মাননীয়, সে নাটক করে, বুদ্ধিজীবী, তার পরিচিতি অনেক, তার জন্য মিডিয়া আসবে, জনমত গঠিত হবে, তাই তার জন্য অন্য ব্যবস্থা হল? এত মোলায়েম ব্যবস্থা!

আর সে যদি প্রমোটার হতো, তবে দোষী বা নির্দোষ সন্তানকে মুক্ত করার জন্য বলত, এই রইল টাকার থলে। ওকে মুক্তি দিন।

কিংবা ফলওয়ালা হলে সে কি হাঁটু মুড়ে বসত? কেঁদেই চলত অবিরত! দয়া করুন!

পিতা, সে পিতা, এছাড়া সে কী করতে পারত? কিন্তু সে কি একবারও জানার চেষ্টা করল, তার সন্তান কতখানি দোষ করেছে, সে কি নির্দোষ? সে নিজে নিজেই কতগুলো তর্ক, কতগুলো যুক্তি সাজালো—তারপর মুক্তি দিল সন্তানকে? সে কঠিন হতে পারেনি। সে কী ভয় পেল? তার সন্তান অজস্র নেশার উপকরণের ভেতর দিয়ে ঘুরে ফিরে এসেছে। কেন? শুধুই কি কৌতূহল? না কি তার মনে কোনও আঁধার জমে আছে? ওকে কি কোনও সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাবে? আর সেই সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিজেরা গিয়ে বসবে, বলবে আমরা পারিনি, ওকে সুস্থ জীবনের স্বাদ দিতে! আমরা ব্যর্থ!

তার কি এত সাহস আছে, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার? সে কি সত্যি সত্যি বালির ভেতর মুখ ডুবিয়ে ঝড় এড়িয়ে যেতে চাইছে? সে কি প্রলয় দেখবে না বলে অন্ধ সাজছে?

সারারাত অমিত্রসূদন অজস্র প্রশ্নের ভেতর দিয়ে চলল। সে এক অনন্ত পথ। এদিকে গিরিখাদ, ওদিকে সুউচ্চ পাহাড়। চারপাশে অচেনা গন্ধ! খুব কাছে, একেবারে বুকের কাছেই যেন কুয়াশা জমে! দু-হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে তাকে পথ চলতে হচ্ছে। খাদ আর পাহাড় তাকে চেপে ধরছে। না, না, আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়, বড় দেরি হয়ে যাবে। সেই পথ পেরিয়ে সে দ্রুত যেখানে এসে দাঁড়াল, সেই বাড়িটা একতলা, কিন্তু খুব ছোট নয়। তার সারা অঙ্গে মলিনতা। অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। সামনে বেশ কিছুটা বাগান। বাড়ির গেটের পাশেই পেতলের ফলক। কালো হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে স্পষ্ট হয়ে আছে কয়েকটা নাম অনিলাভ চ্যাটার্জি, মণিকুন্তলা চ্যাটার্জি, কণিষ্ক চ্যাটার্জি।

অমিত্রসূদন গেট ঠেলার আগেই একজন এগিয়ে এল।

অমিত্রসূদন বলল, 'আমি মণিকুন্তলা চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে চাই। উনি আছেন?'

'দিদির সঙ্গে? উনি তো টিউশন পড়ান না।'

'না, আমি অন্য দরকারে এসেছি।'

মহিলা একটু থমকে গেল। বলল, 'না, অনেকে তো টিউশন পড়াতে আসে, আমি ভাবলাম আপনিও পড়াতে এসেছেন। আসুন। দিদি জিগ্যেস করলে কী বলব, কী দরকার

আপনার?'

'আমার নাম অমিত্রসূদন দাশগুপ্ত। আমি নাটক করি। এটুকুই বলুন।'

'আপনি বসুন। নাটক করেন? টিভিতে দেখায়?'

অমিত্রসূদন ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ বা না কি বুঝল কে জানে, মহিলা ভেতরে চলে গেল। তার চোখে মুখে অবাক হওয়া ভাব। নাটক করে, এর কী দরকার মণিকুন্তলার সঙ্গে?

কয়েক মিনিট পরেই মণিকুন্তলা এলেন। অমিত্রসূদনের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি মণিকুন্তলা চ্যাটার্জি।'

'আমার নাম অমিত্রসূদন দাশগুপ্ত।'

'হ্যাঁ, মানসী বলল। আপনি নাটক করেন। তা আমার কাছে কেন ঠিক বুঝলাম না।'

অমিত্রসূদন একটু চুপ করে থাকল। খুব ধীর গলায় বলল, 'কাল আপনার কাছে লালবাজার থেকে কোনও ফোন এসেছিল?'

মণিকুন্তলার মুখটা কঠিন হল। সমস্ত রেখাগুলো জমে গেল।

অমিত্রসূদন বলল, 'আপনার ছেলে কণিষ্ক কাল পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। পুলিশের কথামতো ওর ব্যাগে দশ লক্ষ টাকার ড্রাগস ছিল। ওকে ওরা অনেকদিন ধরে খুঁজছে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। এমনকী ওর জন্য ওরা হিমাচলের কসোল পর্যন্ত গিয়েছিল। সে সময় ওকে পায়নি। ওদের কাছে আপনার ছেলে একজন মোস্ট ওয়ান্টেড ড্রাগস পেডলার। ড্রাগস বিক্রি করে।'

মণিকুন্তলা বসলেন। শাড়ির আঁচল গুছিয়ে রাখলেন কোলের ওপর। বললেন, 'আপনার পরিচয়টা আমার কাছে স্পষ্ট হল না। কিছু যদি মনে না করেন—'

'আমি নাটক করি। একটা ছোট গ্রুপ থিয়েটারের দল আছে। কাল আমি ওই পুলিশের গাড়িতে ছিলাম।'

'নাটকই কি আপনার প্রোফেশন? না কি চাকরি করেন? কী চাকরি?'

'খুব সাধারণ একটা সরকারি চাকরি।'

'সেটা পুলিশের সঙ্গে নিশ্চয়ই নয়? তবে কী, পুলিশের সঙ্গে আপনার চেনাজানা আছে? ওরাই আপনাকে পাঠিয়েছে? ওদের সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে যে ডিল হবে সেটা আপনি মধ্যস্থতা করবেন?'

'না, না, আপনি ভুল ভাবছেন।'

'আমি কিছু ভাবছি না। আগে ভাবতাম, এখন আমি ভাবা ছেড়ে দিয়েছি। আমি আপনাকে বলি, যদি আপনি পুলিশের লোক হন, সোজা কথায় ব্রোকার হন, তবে ফিরে যান। ছেলের পাপ স্খালনের জন্য আমি কোনও ডিলের মধ্যে নেই। এছাড়াও আপনি যদি ল' ইয়ারের লোক হন, তাহলেও আপনাকে আমি একই কথা বলব, আপনি ফিরে যান, ছেলের জন্য আমি কোনও উকিল দাঁড় করাব না। কোনও আইনি সাহায্য নেব না। আমি পুলিশের সঙ্গে কোনও নেগোসিয়েশনে যাব না। কোনও ডিল করব না। কণিষ্ক পাপ করেছে, ও ওর পাপের শাস্তি পাক। সেখানে আমি কোনও ভূমিকায় থাকতে চাই না। হ্যাঁ, আমি ওর মা—সেজন্য আমি লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। তাই আপনাকে বলব, আপনি ফিরে যান।'

অমিত্রসূদন দু-হাত জোড় করে বলল, 'আমি তেমন কিছুই নই। আমি খুব সাধারণ একজন চাকুরিজীবী, আর মনে প্রাণে একজন নাট্যকর্মী। আমারও একটি ছেলে আছে। কণিষ্কের থেকে কয়েক বছরের ছোট। আমি বাবা হিসেবে দৌড়ে এসেছি আপনার কাছে। আমি একজন বাবা। পিতা। কাল পাপচক্রে আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম। ওরা আমাকে পাঠায়নি। ওরা আপনার ছেলের ওয়ালেট থেকে আপনার একটা কার্ড পায়। সেই কার্ডটি থেকে আমি আপনার নাম ও ঠিকানা জানতে পারি, আর কিছু নয়।'

মণিকুন্তলা স্থির চোখে অমিত্রসূদনের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

অমিত্রসূদন বলল, 'আমি আসতাম না। আমার আসার কোনও কথাও না। কিন্তু কাল ওদের কিছু কথাবার্তা শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল। ওরা ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। হয়তো ওকে মারধর করবে। ওরা যেমন মারধর করবে, তা সহ্য করার মতো ক্ষমতা আপনার ছেলের নেই। ভয়ঙ্কর একটা কিছু কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। আর ও যদি কোনও কথা না জানায়, ওকে ওরা মেরেও ফেলতে পারে।'

মণিকুন্তলা বললেন, 'চা খান।'

দরজার পাশেই চায়ের ট্রে হাতে মানসী দাঁড়িয়ে। ওদের দুজনের জন্য দু-কাপ চা দিয়ে গেল। মণিকুন্তলা হাতের ইশারায় চায়ের কাপ দেখিয়ে নিজের চায়ের কাপটা তুলে নিলেন। কাপটা মুখের সামনে এনে দু'চোখ বন্ধ করে বসলেন।

অমিত্রসূদন চায়ের কাপ তুলতে গিয়ে প্লেটে অনেকটা চা চলকে দিল। খুব সন্তর্পণে সে চা খেল। এত সাবধানতা সত্ত্বেও দু-ফোঁটা চা পড়ল তার পাঞ্জাবিতে। অমিত্রসূদন দেখল, কিন্তু সেখানে আর চোখ রাখল না। সে কি ভেতর ভেতর কাঁপছে? ঘরের ভেতর কোনও শব্দ নেই।

চায়ের কাপ রাখতে মণিকুন্তলা বললেন, 'আপনি কি আর কিছু বলবেন? নইলে'—

ঘাড় নাড়ল অমিত্রসূদন। 'বলব। বলব, ওর খুব বিপদ! আপনি একবার যান।'

'আপনি কি এই বিপদের খবরটাই দিতে এসেছেন আমাকে?'

'হ্যাঁ। ওদের কথাবার্তা আমার ভালো লাগেনি। ওরা এমন কিছু করতে পারে— খারাপ কিছু।'

মণিকুন্তলা স্থির চোখে চেয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। বললেন, 'ওকে ধরেই কাল ওরা আমাকে জানিয়েছে। আমি ওদের যা বলার বলে দিয়েছি। আমার আর কিছু বলার নেই।'

'কী বলেছেন আপনি?' অমিত্রসূদন হাঁপায়, 'বলেছেন আমার ছেলে মৃত, আপনাকে যেন আর না বিরক্ত করা হয়!'

'আপনি তো জানেন। দয়া করে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না। আমি ওদের বলেছি। আমি আপনাকেও সে কথাই বলছি। আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।'

'মিসেস চ্যাটার্জি কণিষ্ক বেঁচে, এখনও বেঁচে আছে, ও বেঁচে না থাকলে পরিচয় গোপন করত না। ওদের বলত না, আপনাকে না জানাতে। কণিষ্ক বলেছে, মা জানে আমি হিমাচলে আছি, কসোলে আছি, ভালো আছি। আমার মারা যাওয়ার খবর পেলে মা কষ্ট পাবে। ও আপনাকে কষ্ট দিতে চায় না। আপনার ছেলে বেওয়ারিশ লাশ হতে চায়।'

'কণিষ্ক আমাকে কষ্ট দিতে চায় না। আর আমিও কাউকেই কষ্ট দিতে চাই না।' মণিকুন্তলা থামেন, 'আমার কাছে কণিষ্ক মৃত। জীবিত নয়। ও যদি আমার কাছে বাঁচে,

তবে আপনি কষ্ট পাবেন, আপনার স্ত্রী কষ্ট পাবে, বা আপনাদের মতো অসংখ্য বাবা-মা তাদের সন্তানের জন্য কষ্ট পাবে। তার থেকে এই ভালো নয় কি? আমার ছেলে মৃত, সে আর কাউকে মৃত্যুমুখে টেনে নিয়ে যেতে পারছে না, পারবে না, সে আর কাউকে মারণ নেশার খাদে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে না, দেবে না। অসংখ্য বাবা-মায়ের চোখের জলে তার নাম লেখা থাকবে না। এর চেয়ে শান্তির কী আছে বলুন? আমি যদি এমন করে ভাবি। কণিষ্ক মারা গেছে। সে কাউকে নেশার উপকরণ জোগাচ্ছে না। কাউকে নেশা করানোর জন্য প্রলুব্ধ করছে না। সে আর কোনও বাবা-মা ভাই-বোনের কষ্টের কারণ হচ্ছে না। কারণ সে মৃত। সে জীবিত মানেই আবার অনেক মানুষের চোখের জল, হাহাকার। আমার কাছে কণিষ্ক মৃত—মৃত মানুষ কারও ক্ষতি করতে পারে না।'

মণিকুন্তলা থামেন। আঁচল তুলে মুখ মোছেন। 'ওকে যদি বুকের দুধ দিয়ে আবার জীবিত করি ও আবার মারণ খেলায় মেতে উঠবে। ওকে মরে যেতে দিন অমিত্রসূদনবাবু। ও মরে গেলে ওর আত্মার শান্তি কামনা করবেন, যেন ও শান্তি পায়। আমার ঘরের টেবিলে ওর ছবি আছে। যেদিন নিশ্চিত হব সেদিন কাঁদব, আর কিছু ফুল দেব। আমি তো মা। অমিত্রসূদনবাবু, সন্তান শোকের মতো কঠিন কিছু নেই! আমি ওকে বুকের দুধ দিয়ে বাঁচাব না—আপনারা সন্তান শোক সামলাতে পারবেন না! ও মৃত হলে আপনারা বাঁচবেন। ভালো থাকবেন।'

ভূতগ্রস্তের মতো অমিত্রসূদন উঠে দাঁড়ায়। তাকে বাঁচতে হবে, ভালো থাকতে হবে। সে ছিটকে বেরিয়ে আসে বাড়িটা থেকে।

মণিকুন্তলা হয়তো ঠিকই বললেন, সন্তান শোক বড় কঠিন। না, না সে সামলাতে পারবে না। সে পারবে না। শকুন্তলাও পারবে না। কোনও বাবা মা-ই পারবে না। বড্ড ভারী সে শোক!

অমিত্রসূদন হাঁটতে শুরু করে, তার মাথার ভেতর কোনও স্রোত নেই, স্তব্ধ। টালিনালার জলে এমন হয়, রাশি রাশি ছোট-বড় সাদা রঙিন প্লাস্টিকের প্যাকেট হাজার হাজার মানুষের অনেক হ্যাপা সামলে জলে ভাসতে ভাসতে, জল নয় প্লাস্টিকের স্রোত হয়ে বয়ে যায়। টালিনালা এ-শহরের বিষবাষ্প মাখা এক কালো করোটি! আর অমিত্রসূদন দাশগুপ্ত কিছু না। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র থেকে শুরু করে যেখানে যত বাবা আছেন, বাপ আছে, তাদের মতোই শুধুমাত্র একটি সাদা পোস্টার! শুধুমাত্র অপেক্ষা করা কখন ষাঁড়টি এসে পোস্টারটি ছিঁড়েখুড়ে...

আসুন, আপাতত দরজা-জানলা খুলে অথবা বন্ধ করে, আড়ালে-আবডালে অথবা প্রকাশ্যে সময়ের এই মধ্যরাতের উল্লাসে মাতি! হা-হা শহর! হা-হা ধোঁয়ার শহর! মৃত্যুর ঘ্রাণে কালো করোটির ভেতর হু-হু রঙের স্রোত! রঙিন স্বপ্ন!